অথ সাঁওতাল কথা

(মহান সাঁওতালি পরম্পরার অনুসন্ধানে)

বুদ্ধেশ্বর টুডু



বিজয়ন প্রকাশনী
৩াব, সীতাকান্ত ব্যানার্জ্জ লেন,
কলকাতা ৭০০০০৫

ATHA SANTAL KATHA
by Buddheswar Tudu

প্রথম প্রকাশ :২০০০

প্রকাশক :
সাধনা মুখোপাধ্যায়
৩বি, সীতাকান্ত ব্যানার্জি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা ব্লক অ্যান্ড প্রিন্ট
৫২/২, শিকদারবাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪

অক্ষরবিন্যাস :
প্রদ্যুৎ সাহা ও প্রণব সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙ্গা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আমার সর্ব কনিষ্ঠ

ভ্রাতা যাকে তার নামকরণ হবার আগেই আমি হারিয়েছি

তার অমর আত্মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

মুখবন্ধ

অথ সাঁওতাল কথা (মহান সাঁওতালি পরম্পরার অনুসন্ধানে) এক মহান জাতির কথা বাস্তবের উপর ভিত্তি করে রচিত। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার কথায় যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, সাঁওতালরা অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের মহান ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি নিয়ে। ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি যদিও অবলুপ্তিব পথে কিন্তু এখনো তার বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনুসন্ধান করলে তার দেখা মিলবেই। সমাজের মূলস্রোতে আসার জন্য তারা সংগ্রামে অবিচল, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আজ স্বাধীনতার বয়স ৫০ অতিক্রান্ত অথচ একমাত্র সংরক্ষণ ছাড়া ভারতবর্ষের আদিবাসীদের জন্য আর কিছুই করা হয়নি। আবার সংরক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসীদের উন্নয়নের চেয়ে ভোট হস্তগত করতেই রাজনৈতিক দলগুলি বেশি উৎসাহী। এক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে এদের খুব একটা ফারাক নেই। এ প্রসঙ্গে W.W. Hunter এর মন্তব্য বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"While the fair skinned race which usurped the plains has become the favourite child of modern scholarship, the dark face primitive heritors of the soil have continued as we found them, uncared for, despised, hiding away among their immemorial mountains and forest".

তথাকথিত সভ্যদের আধুনিক হবার পেছনে আছে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা, তার কানাকড়ি যদি আদিবাসীরা পেত তাহলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত আন্দাজ করা মুস্কিল। ইংরেজরা আদিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করবার জন্য যতটা তৎপর ছিল, মানুষ করে তোলবার জন্য তাদের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টাও ছিল না। এ কথা W. W. Hunter এর মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, "In the hope that I may able to interest both the scholar and statesman in these lapsed races, I propose in the following chapter to set forth what I have been able to learn regarding the history, language, the manners, and the capabilities of the mountaineers of Beerbhoom, the scholar will find that their language and traditions throw an important light on a unwritten chapter, in the history of our race. Indian Statesman will discover that these children of the forest

are not so utterly fallen away from the common wealth of nations as he has supposed, that they are prompted by the same motives of self interest, amenable to the reclaiming influences as other men, and that upon their capacity for civilisation the future extension of English enterprise in Bengal in a large measure depends."

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে এদের ভাষায়, আচার, আচরণে তাই তাকে জানা খুবই দরকার। আলোচ্য অথ সাঁওতাল কথা তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

আমি যেমন দেখেছি, বুঝেছি সে ভাবেই এখানে তুলে ধরেছি, কিন্তু আমার দেখায় ভুল থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন, তবে অবশ্যই স্বাগত জানাব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পবিত্র সরকারকে বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে আমার অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মান্যবর অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। তাই অমরজ্যোতি বাবুকেও ধন্যবাদ।

২৩ জানুয়ারি ২০০৪
সাঁত্রাগাছি

বুদ্ধেশ্বর টুডু

"পৌরাণিক কাহিনী"

সাঁওতালদের নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কৌতূহলের অন্ত নেই। এ পর্যন্ত সাঁওতালদের নিয়ে বহু পুঁথি রচিত হয়েছে, গ্রন্থাগারে সে সব পুঁথি সযত্নে রক্ষিত আছে। সেখানে পণ্ডিতরা নিজেদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করেছেন। সাঁওতালদের সম্বন্ধে তাঁরা সবাই কিছু না কিছু আলোকপাত করেছেন, তাই আমি সে চেষ্টা থেকে বিরত থেকে আজ এমন কিছু বলব যেটা ইতিপূর্বে কেউ বলেনি, এখনো পর্যন্ত, আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি।

সাঁওতালরা অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁরা কোথা থেকে এল, তাদের উৎপত্তিই বা কোথায় সেটা তাদের মধ্যে প্রচলিত, মুখে মুখে চলে আসা কাহিনী থেকেই শুনব। (কাহিনীটি আমার লেখা 'সাঁওতালি ভাষার লিপি সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের সন্ধানে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমি সেটাকে তুলে এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।)

ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে জানা যায় যে, বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষ বর্তমানের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এ্যাপ নামক একপ্রকার বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি। এই বানর চার পায়ে গাছের এ ডাল থেকে সে ডালে ঘুরে বেড়াত। এঙ্গেলসের মতে কোনো কারণে গাছে খাবারের অভাব দেখা দিলে তারা মাটিতে নেমে আসে। মাটিতে নেমে তারা বুঝল যে, এখানে চার পায়ের বদলে দু পায়ে হাঁটাই সুবিধাজনক। তাই তারা দু পায়ে হাঁটা শুরু করল। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এটাকে কর্মী মানুষের শ্রমের ফল বলে অভিহিত করেছেন। বানর থেকে মানুষ এবং আদিম মানুষ থেকে বর্তমান যুগের মানুষ পর্যন্ত এই যে প্রক্রিয়া, একশ, দুশ নয় কয়েক হাজার বছরের ঘটনা। কার্ল মার্কস আদিম মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমানের সভ্য মানুষ পর্যন্ত যে সমাজব্যবস্থা তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং সাম্যবাদী সমাজ। আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠী সমাজে মানুষ দলবদ্ধ ভাবে বাস করত এবং যাযাবরের মত জীবন-যাপন করত। তখন শিকার এবং ফলমূল আহরণ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। দিনের শেষে যা সংগৃহীত হত তা সকলে সমান ভাবে ভাগ করে খেত। বিবর্তনের এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাঁওতালদের

ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী এই মতবাদকেই সমর্থন জানায়। তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতে আছে, সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পূর্বদিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে সূর্য উদিত হয় সেই দিকেই মানুষের উৎপত্তি। আদিতে পৃথিবীতে কেবল জল ছিল। বৈজ্ঞানিকরাও এই জলের কথা স্বীকার করেন, তবে তাঁদের মতে জল উষ্ণ ছিল। এই উষ্ণ জল ক্রমশ শীতল হয় এবং জলজ উদ্ভিদের জন্ম হয়। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতেও সেই কথাই বলা হয়েছে, যে তখন শুধু জল ছিল, স্থল বলতে কিছুই ছিল না। দেবতারা স্বর্গ থেকে তোড়ে সুতাম (সুতো) বেয়ে এখানে স্নান করতে আসতেন। একদিনের কথা। সৃষ্টিকর্তা ঠাকরজীউ স্নান করতে নেমেছেন। তিনি ঘাটে বসে গায়ের অনেকটা ময়লা ছাড়ালেন। সেই ময়লা দিয়ে দুটো পাখি বানালেন। পাখি দুটো দেখে তাঁর খুব মায়া হল তাই তিনি তাঁদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করলেন।

বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা এক। অন্যদিকে লোকপুরাণের স্রষ্টা একদলের মতে ঠাকুর জীউ প্রথমে জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। (ধিরি কাটকম) পাথর কাঁকড়া, কুমীর, তিমি মাছ, রাঘব বোয়াল সলে চিংড়ি (সলে ইচাঃক), কেঁচো এবং কচ্ছপ আদি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এরপরে সৃষ্টিকর্তা ভাবতে লাগলেন তিনি কি তৈরি করবেন? তিনি ঠিক করলেন এইবারে তিনি মানুষ তৈরি করবেন। তাই হল। তিনি মাটির দুটো মূর্তি গড়লেন। একটা পুরুষের এবং অন্যটা মেয়ের। এই মূর্তি দুটোর মধ্যে যখন প্রাণ সঞ্চার করবেন ঠিক করছেন ঠিক সেই সময় স্বর্গ থেকে সিঞ বোঙ্গার (সূর্যদেব) সিঞ সাদম (ঘোড়া) জল খেতে নেমে মূর্তি দুটোকে পা দিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর জীউ বেজায় দুঃখ পেলেন। তাই তিনি ঠিক করলেন, না, তিনি আর মানুষ তৈরি করবেন না। তৈরি করবেন পাখি। বুকের ময়লা ছাড়িয়ে দুটো পাখি বানালেন এবং প্রাণ দিলেন। পাখি দুটোর নাম দিলেন হাঁস এবং হাঁসিল। নামকরণ থেকে অনেকেই পাখি দুটোকে হাঁস (পুং এবং স্ত্রী) বলে মনে করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কারণ সাঁওতালি ভাষায় হাঁসকে বলে গেড়ে। যদি তারা হাঁস হত তাহলে হাঁসের বদলে গেড়ে বলা হত। আমার মতে হাঁস এবং হাঁসিল পাখি দুটোর নাম। কারণ সাঁওতালরা যে বারো গোত্রে বিভক্ত, সেই বারোটির একটাকে বলা হয় হাঁসদাঃক। সাঁওতালি দাঃক কথার অর্থ হল জল, তাহলে হাঁস কথার অর্থ যদি হাঁস হয়, তাহলে হাঁসদাঃক মানে কি জলহাঁস? মাটিকে সাঁওতালি ভাষায় বলে হাসা, আমার মতে এই হাসা বা মাটির তৈরি বলেই তাদের নামকরণ হয় হাঁস এবং হাঁসিল। নিম্নে প্রদত্ত দং সেরেঞটা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জমআবন ঞুইআবন রাইস্কারেবন তাঁহেনা
নওয়া হাসা হড়ম বার সিঞ লাগিৎ।।

অর্থাৎ, 'খাব দাব স্ফূর্তিতে থাকব
এই মাটির দেহ দুদিনের জন্য।'

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' আর সাঁওতালরা বলেন হাসা হড়ম। তাঁদের বিশ্বাস শরীর মাটি দিয়ে তৈরী এবং মাটিতেই মিশে যাবে। সে যাই হউক প্রাণ পেয়ে পাখি দুটো আকাশে ডানা মেলে দিয়ে মনের আনন্দে উড়তে লাগল, কিন্তু বসার জায়গা কোথাও ছিল না। তাই ঠাকুর জীউ-এর হাতে এসে বসত। এইভাবেই দিন যায়। একদিন সিঞ সাদম তেষ্টা মেটাতে স্বর্গ থেকে তোড়ে সুতাম বেয়ে মর্তে এলেন। মুখ দিয়ে জলপান করবার সময় ঘোড়ার মুখ থেকে ফেনা জলে গড়িয়ে পড়ল। সৃষ্টি কর্তা পাখি দুটোকে সেই ফেনার উপরে গিয়ে বসতে বললেন। পাখি দুটো ঠাকুর জীউ এর কথামত সেই ফেনার উপরে গিয়ে বসল এবং ফেনার সঙ্গে দমকা হাওয়ায় নৌকোর মত ভাসতে লাগল। তারা মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেল বটে কিন্তু খাবার কিছুই পেল না, তাই তারা পুনরায় ঠাকুর জীউ এর স্মরণ নিল। ঠাকুর জীউ তাঁদের কথা শুনে জলচর প্রাণীদের ডেকে পাঠলেন এবং নীচ থেকে মাটি তুলতে বললেন। প্রথমে ডাকলেন কুমীরকে। কুমীর এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? ঠাকুর কুমীরকে বললেন জলের নীচে মাটি আছে, সেই মাটি তুলতে হবে। সে কি পারবে? কুমীর জবাব দিল যদি তিনি আজ্ঞা করেন তবে সে পারবে? এই বলে কুমীর নীচে নেমে গেল। কিন্তু মাটি তুলতে ব্যর্থ হল। এইভাবে পরপর চিংড়ি মাছ, রাঘব বোয়াল মাছ এবং কাঁকড়াকে ডেকে পাঠালেন, এবং সবাইকে এক কথাই বললেন। কিন্তু সবাই মাটি তুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল।

সবশেষে ঠাকুর কেঁচোকে ডেকে পাঠালেন এবং মাটি তুলতে বললেন। কেঁচো রাজি হল তবে একটা শর্ত দিল। শর্তটা হল এই যে, সে মাটি তুলবে তবে কচ্ছপকে জলের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে। কেঁচোর কথা শুনে ঠাকুর কচ্ছপকে ডেকে পাঠালেন। কচ্ছপ এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন। ঠাকুর সব কথা খুলে বললেন। ঠাকুরের কথা শুনে কচ্ছপ জলের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ঠাকুর কচ্ছপের চারটে পা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে দিলেন। এইবারে কেঁচো কচ্ছপের পিঠে লেজ রেখে মুখ নীচে নামাল। মুখ দিয়ে মাটি খেতে লাগল এবং লেজ দিয়ে কচ্ছপের পিঠে সেই মাটি বার করে দিতে লাগল। এইভাবে কেঁচো কচ্ছপের গোটা শরীর মাটিতে ভরিয়ে দিয়ে খাওয়া বন্ধ দিল এবং উপরে উঠে এল।

এইবার ঠাকুর মই দিলেন। (তখনকার দিনে এবং এখনো গরু মহিষের কাঁধে

জোয়াল চাপিয়ে তার সঙ্গে মই জুড়ে মাটিতে মই দিতে হয়। এ থেকে এমন মনে করা আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই কাহিনী কৃষিকাজ শুরু হবার পরের রচনা)। ঠাকুর মই দিলেন বটে, কিন্তু মাটি সমান করতে সমর্থ হলেন না। মাটি কোথাও কোথাও উঁচু আবার কোথাও কোথাও নীচু হয়ে রইল। আর এই ভাবেই পাহাড় পর্বত এবং নদ-নদীর সৃষ্টি হল। মাটি যেখানে যেখানে উঁচু হয়ে রইল সেখানে সেখানে পাহাড়-পর্বতের, অপর দিকে আবার যেখানে নীচু ছিল সেখানে সৃষ্টি হল নদ-নদীর। সব মিলিয়ে বলা যায় স্থলভাগের বা পৃথিবীর সৃষ্টি হল। ঘোড়ার মুখের ফেনা এই স্থলভাগে এসে আটকা পড়ে গেল। ঠাকুর সেই ফেনার উপরে সিরম (এক রকম গাছ) গাছের চারা বুনলেন। সেই চারা থেকে সিরম গাছ জন্মাল। তারপর পরে পরে দুর্বা ঘাস, করম গাছ, শাল গাছ, মহুয়া গাছ এবং অন্য সব গাছের চারা বুনলেন এবং সেই চারা থেকে গাছ জন্মাল। মানুষ তখনো সৃষ্টি হয়নি।

এই যে কাহিনী এটা নিছক কাহিনী নয়। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। এখান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হব যে, ঠাকুর মানুষ সৃষ্টি করবার আগে এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। পৃথিবীতে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বনডাই অক্সাইড আছে। কার্বনডাই অক্সাইড মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তাই গাছ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে মানুষকে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে, তাই ঠাকুর মানুষ সৃষ্টির আগে গাছের চারা বুনেছেন। অতএব অস্বীকার করার উপায় নাই, সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ ছাড়া গাছ আমাদের আর একটা উপকারে লাগে তা হল গাছ মাটিকে শক্ত হতে সাহায্য করে। এই কারণেই লোকে পুকুরপাড়ে এবং অন্যত্র গাছ লাগায়।

হাঁস-হাঁসিল পাখি দুটো সেই সিরম গাছে বাসা বাঁধল এবং দুটো ডিম পাড়ল। মেয়ে পাখি সেই ডিমে তা দিতে লাগল এবং পুরুষ পাখি বাইরের কাজে ব্যস্ত রইল। Division of Labour বা শ্রম বিভাজনের অনুমান এখানে পাই। কৃষিকাজের পরবর্তী পর্যায়ে পুরুষ মানুষ ক্ষেত খামারের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল ফলে বাড়ির কাজ দেখাশোনা করবার একটা মানুষের প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হল এবং স্ত্রী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হল। এখানে সেই মতবাদই ব্যক্ত হয়েছে।

কিছুদিন পরে সেই ডিম দুটো থেকে দুটো বাচ্চা জন্ম নিল। পাখির ডিম থেকে পাখির বাচ্চা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে তা হয়নি। এখানে পাখির ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে দুটো মানুষ। পৃথিবীর আদি মানব-মানবী, পিলচু হাড়াম

এবং পিলচু বুড়হি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি এ্যাপ নামক এক প্রকার বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়। এই কাহিনী সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তুলে ধরেছে। জানতে খুব ইচ্ছে হয় কয়েক হাজার বছর আগে সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা এই কথা জানলেন কি করে? তবে কি আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে যে উন্নত জাতি গোষ্ঠী ছিল তারাই সাঁওতাল। ঐতিহাসিকরা বলেন আর্যরা ভারতে আগমনের পূর্বে অসভ্য এবং বর্বর ছিলেন। ভারতবর্ষে এসেই তারা বাড়ি তৈরির কৃৎকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। আর্যরা যাদের কাছ থেকে বাড়ি তৈরির Technology শিখেছিলেন তারাই কি সাঁওতাল? এই কাহিনী সেই সন্দেহকেই ঘনীভূত করে।

ডিম ফুটে দুটো মানুষ জন্ম নিল। একটা পুরুষের অন্যটা মেয়ে মানুষের। ঐতিহাসিক রাখালদাস ব্যানার্জী ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ রাজাদের খেড়িয়া বংশোদভূত বলে মনে করেন। কারণ আবিষ্কৃত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ভঞ্জ রাজাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে তাদের পূর্বপুরুষরা ডিম ফুটে বেরিয়েছিলেন। খেড়িয়াদের মধ্যে অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত থাকায় এইরূপ সন্দেহের কারণ। ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ হচ্ছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা জানি যে সাঁওতালদের মধ্যেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। এ ছাড়াও ভঞ্জ রাজাদের সঙ্গে সাঁওতালদের আর একটা জায়গায় মিল আছে তা হল সন্তান সন্ততির নামকরণ। ভঞ্জ রাজাদের মত সাঁওতালরা তাদের সন্তান সন্ততির নামকরণ করেন তাদের পূর্বপুরুষদের নামানুসারে। সাঁওতালদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি শহরে নগরে এসে বিজাতীয় মেয়ে বিয়ে করে গোত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে। আমি দাবী করছি না যে ভঞ্জ রাজারা সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্তই, কারণ এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে তারা যে সাঁওতালি মঞ্জ যার অর্থ খুব ভালোতা থেকেই ভঞ্জ হয়ে যায়নি একথা কে বলতে পারে?

সে যাই হউক হাঁস-হাঁসিল মানুষ দুটোকে দেখে হায়! হায়! বলে কাঁদতে লাগল।

হায়! হায়! জ্বালাপুরীরে
হায়! হায়! নুকিন মানওয়া।।
হায়! হায়! বুঁসাড় আকানকিন
হায়! হায়! নুকিন মানওয়া।।
হায়! হায়! তকারে দহকিন
হায়! হায়! দুসে লাই আয়বেন।।
হায়! হায়! মারাং ঠাকুর জীউ
হায়! হায়! বুঁসাড় অকাননকিন।।

হায়! হায়! নুকিন মানওয়া
হায়! হায়! তকারে দহকিন?

(হুড় করেন মারে হাপড়ামক রেয়াঃ কাথা থেকে সংগৃহীত)

তিনটে পুরী আছে। স্বর্গপুরী, মর্তপুরী আর পাতালপুরী। মর্তপুরীই জ্বালাপুরী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জ্বালা যন্ত্রণা আছে বলেই পাখি দুটো হায়! হায়! জ্বালাপুরী বলে রোদন করতে লাগল। তাই জ্বালাপুরীকেই হায়! হায়! ধ্বনি দিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে। Shame, Shame ধ্বনির মত।

(রূপান্তর লেখকের)

হায়! হায়! মর্ত্যপুরীতে
হায়! হায়! এই দুই মানব।।
হায়! হায়! জন্ম নিয়েছে
হায়! হায়! এই দুই মানব।।
হায়! হায়! এদের কোথায় রাখি?
হায়! হায়! যাও বলনা গিয়ে।।
হায়! হায়! মহান ঠাকুর জীউকে
হায়! হায়! জন্ম নিয়েছে।।
হায়! হায়! এই দুই মানব
হায়! হায়! এদের কোথায় রাখি?

হায়, হায় ধ্বনি এখানে দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পঙক্তিতে যদিও মর্ত্যলোককে ধিক্কার জানানো হয়েছে তবে পরবর্তী পঙতি গুলিতে কিন্তু হায়, হায় দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। করুণা এবং ধিক্কার। কারণ মানুষ দুটোকে দেখে হাঁস হাঁসিলের সামনে সংকট দেখা দিয়েছে। প্রথমত, তারা কোথায় থাকবে। দ্বিতীয়ত, তারা কি খাবে? হাঁস-হাঁসিল, পাখি তারা গাছের ডালে বাসা বানিয়ে থাকবে। কিন্তু মানুষ ত সেখানে বাস করতে পারবে না। তাই সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জীউ এর কাছে তাদের কাতর আবেদন নিবেদন। পাখিদের কাতর আবেদনে ঠাকুর সাড়া দিলেন। পাখিদের কাছ থেকে সব কথা শুনে তিনি তাদের তুলো দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যা খাবে তার রস দিয়ে তুলো ভেজাবে এবং খাবারের রস দিয়ে ভেজানো সেই তুলো মানুষ দুটোর মুখে দিয়ে নিংড়াবে। তারা তাই করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মানব মানবী দুটো বেড়ে উঠতে লাগল। তাদের বড় হতে দেখে পাখিদের চিন্তা বেড়ে গেল, ভয় পেতে লাগল, তাই তারা পুনরায় সৃষ্টিকর্তার স্মরণ নিল। সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর জীউ তাদের থাকার জন্য একটা জায়গা খুঁজতে বললেন। তারা পশ্চিমদিকে উড়ে গেল এবং হিহিড় পিপিড়ির খোঁজ পেল। ফিরে

এসে ঠাকুর জীউকে তারা সেই কথা জানিয়ে দিল। সৃষ্টিকর্তা মানব-মানবী দুটোকে সেখানে রেখে আসতে বললেন। ঠাকুরের কথামত পাখিরা মানুষ দুটোকে পিঠে করে হিহিড়ি পিপিড়িতে পৌছে দিল। তারপর হাঁস এবং হাঁসিলের কি দশা হল তা জানা যায় নি।

এইভাবে শুরু হল যাযাবরের জীবন। তাদের কথায় পূর্বদিকে তাদের উৎস ভূমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে হিহিড়ি পিপিড়িতে এলেন। কেউ কেউ হিহিড়িকে হিমালয় পর্বত বলেন এবং পিপিড়িকে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সমতল ভূমি বলে অভিহিত করেন। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার ও এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে হিহিড়ি এবং পিপিড়ি একটাই শব্দ। প্রজাপতিকে সাঁওতালি ভাষায় পিপিড়ি বলে। হান্টার হিহিড়িকে পিপিড়ির প্রতিলিপি বলেই মনে করেন। এবং হিহিড়ি পিপিড়িকে প্রজাপতির বাসোপযোগী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বলেই মনে করেন।

পৃথিবীর আদি মানব-মানবী যারা ডিম ফুটে বেরিয়েছে তাদের নাম দেওয়া হল হাড়াম অর্থাৎ বুড়ো এবং আয়ো অর্থাৎ মা। কেউ কেউ বলেন পিলচু হাড়াম অর্থাৎ পিলচু বুড়ো এবং পিলচু বুডহি অর্থাৎ পিলচু বুড়ি। পিলচু কথার অর্থ অতি ছোট। তারা পূর্বে জন্মেছেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে হিহিড়ি পিপিড়িতে বাসা বেঁধেছেন। তারা ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল কিন্তু তাদের লজ্জার বালাই ছিল না। তাই একদিন হঠাৎ লিটা গডেৎ এসে উপস্থিত হলেন এবং তাদের কাছে ঠাকুরদা বলে পরিচয় দিলেন। তিনি তাদের বনে নিয়ে গেলেন। শেকড় বাকড় সংগ্রহ করে রানু (রান কথার অর্থ ঔষধ, তার থেকেই রানু হয়েছে) বানাতে শিখিয়ে দিলেন এবং সেই রানু দিয়ে হাঁড়িয়া ধরতে বললেন। তারা শ্যামা ঘাস এবং সুমতুবুকুচ ঘাসের দানা ছাড়িয়ে ভাত রান্না করলেন এবং পাত্রে ঢেলে সেই ভাত ঠাণ্ডা করলেন তারপর তার উপর রানু গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিলেন এবং সেই রাণু ছড়ানো ভাত হাঁড়িতে ঢেলে চাপা দিলেন। পাঁচদিন পর লিটা আবার এলেন ততদিনে ভাত পচে হাঁড়িয়ায় পরিণত হয়েছে, তার গন্ধে মাতাল হবার যোগাড় হয়েছে। লিটা সেই হাঁড়িয়া প্রথমে মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নিজেদের খেতে বললেন। সাঁওতালদের মধ্যে এই রীতি এখনো পালন করা হয়। প্রথমে মারাং বরুকে উৎসর্গ করা হয়। তারাও তাই করলেন। প্রথমে মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে অবশিষ্ট হাঁড়িয়া নিজেরা খেলেন। হাঁড়িয়া খেয়ে তাদের নেশা হল। তাই তাদের মধ্যে খুনসুটি শুরু হল এবং সবশেষে খুনসুটি করতে করতে একসময় এক বিছানায় শুয়ে পড়ল। সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছা পূর্ণ হল। পরদিন সকালে লিটা এসে পিলচু হাড়াম বুডহিকে ডাকতে লাগলেন। লিটার ডাক শুনে

তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু বাইরে আসতে সাহস হল না, কারণ এখন তাদের লজ্জা পাচ্ছে। তারা সেই কথা লিটাকে জানাল। লিটার সেই কথা জানাই ছিল। তিনি তাদের তাতে কি হয়েছে বলে আশ্বস্ত করলেন এবং হাসিমুখ করে চলে গেলেন। পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহি তারপর থেকে বটগাছের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকা দিলেন। কাহিনী বাস্তবের উপর ভিত্তি করে রচিত। তাই কোথাও অতিরঞ্জিত করা হয় নি। যা যা ঘটেছিল তার কথাই হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশেষে তারা সন্তান সন্ততির মা বাবা হলেন। তারা সাত ছেলে এবং সমপরিমাণ মেয়ের জন্ম দিলেন। পিলচু হাড়াম ছেলেদের নিয়ে একদিকে শিকারে যায় এবং তার পত্নী পিলচু বুডহি আর এক দিকে শাকপাতা তুলতে যায়। আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠী সমাজে মানুষ শিকার ফলমূল আহরণ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। এখানে সেই কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাবেই দিন যায়। ছেলেমেয়েরাও ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। একদিন ছেলেরা সবাই খাণ্ডেরায় পর্বতে শিকারে গেল। অপরদিকে মেয়েরাও সুডুকুচ পাহাড়ে শাক তুলতে গেল। শাক তোলা হয়ে গেলে মেয়েরা সবাই নিচে বটগাছের তলায় জড়ো হল এবং বটগাছের লম্বা ঝুরিতে দুলতে দুলতে ডাহার গান গাইতে লাগল। উল্টোদিকে ছেলেরাও শিকার শেষে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু মেয়েলি কণ্ঠের সুরেলা আওয়াজে তাদের যাত্রা ভঙ্গ হল। শিকার ছেড়ে তারা সুরেলা আওয়াজের সন্ধান করতে লাগল। গাছ তলায় পৌঁছে বড়জন বড় মেয়ের সঙ্গে, পরের জন তার পরের সঙ্গে এবং এইভাবে আর সবাই নিজেদের সমকক্ষের সঙ্গে জুটি বেঁধে নাচগানে জায়গাটা মুখরিত করে তুলল। নাচগানের শেষে সেই অবস্থায় বাড়ি ফিরল। এই দেখে পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহি তাদের বিয়ে দিলেন। তাদের সন্তান সন্ততি হলে পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহি তাদের গোত্রে বিভক্ত করে সমগোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন।

ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে দেওয়াব রীতি যে এককালে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল এঙ্গেলসও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন ভাই বোনের মধ্যে কেবল বিয়ে নয়, বাড়িতে যখন কেউ বউ হয়ে আসত সে কেবলমাত্র এক ভাই এর বউ নয়, বাড়ির সব ভাইএর বউ বলেই পরিচিত হত। বাবার অগ্রজ অনুজদের বউকে বড় মা ছোট মা বলে ডাকা থেকেই একথা প্রমাণিত হয় বলে তার মত। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ যখন নিকট আত্মীয়দের সন্তান সন্ততির সঙ্গে অনাত্মীয়দের বিয়ে করা ছেলেমেয়ের মানসিক বিকাশের পার্থক্য লক্ষ করল তখন থেকেই নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়। এই কাহিনীও আমাদের সেই কথাই বলে।

পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহি তাদের ছেলেমেয়েকে যে সাতটি গোত্রে বিভক্ত

করেছিলেন সেগুলি হল, সবার বড় (১) হাঁসদাঃক (২) মুরমু (৩) কিস্কু (৪) হেম্ব্রম (৫) মাড্ডি (৬) সরেন এবং সর্বকনিষ্ঠ (৭) টুডু। পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুডহির বংশধররা হিহিড়ি পিপিড়িতে অনেক দিন কাটিয়ে খোজ কামানে চলে এলেন। খোজ কামানে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তারা পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত হল। তারা বন্য জানোয়ারে পরিণত হল। তাই দেখে ঠাকুর ভীষণ চটে গেলেন। তিনি তাদের সৎ পথে ফেরার ডাক দিলেন। কিন্তু তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তাই তিনি একজন আদর্শ দম্পতিকে হারাতা বুরুর (পাহাড়ের) গিরি কন্দরে আশ্রয় দিয়ে ক্রমাগত সাতদিন এক নাগাড়ে আগুন বরষে সব মানুষ এবং তাদের গৃহপালিত পশুসহ সবাইকে মেরে ফেললেন। বেঁচে গেলেন শুধু একজন আদর্শ দম্পতি যারা গিরি কন্দরে আশ্রয় নিয়েছিল। অগ্নি বর্ষণ থেমে গেলে তারা গিরি কন্দর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং পাহাড়ের পাদদেশে ঘর বাঁধলেন ক্রমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।·তখন তারা হারাতা ছেড়ে সাসাংবেডায় এসে উপস্থিত হলেন। (আমার মনে হয় কাহিনীর এই অংশ ভাই বোনের বিয়েকে চাপা দেওয়ার জন্যই সংযোজিত হয়েছে)। এতদিন তারা পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়েছেন। এইবার তারা ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে এসেছেন। এই সাসাংবেডায় এসে তারা পুনরায় গোত্রে বিভক্ত হলেন। আগের সাতটি ছাড়াও এখানে আরো পাঁচটি যুক্ত হল। গোত্রগুলি হল : (১) হাঁসদাঃক (২) মুরমু (৩) কিস্কু (৪) হেম্ব্রম (৫) মাড্ডি (৬) সরেণ (৭) টুডু তার সঙ্গে যে পাঁচটি যুক্ত হল (৮) বাস্কে (৯) বেশরা (১০) পাউরিয়া (১১) চঁড়ে এবং (১২) বেদেয়া। নিম্নে প্রদত্ত সাঁওতালি গানে সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে :

হিহিড়ি পিপিড়ি রেবন জানামলেন,
খোজ কামানরেবন খোজলেন।।
হারাতারেবন হারালেন,
সাসাংবেড়াবেরন জা(ই)ত এনাহো।।
অর্থাৎ, "হিহিড়ি পিপিড়িতে জন্মেছিলাম,
খোজকামানে এসে বিপথিক হলাম।।
হারাতায় এসে সংখ্যার বৃদ্ধি হল,
সাসাংবেডায় এসে গোত্রে বিভক্ত হলাম।।

সাসাংবেডা ছেড়ে দিয়ে পূর্বপুরুষরা জারপি দেশে এলেন। সমতল ছেড়ে পুনরায় পাহাড় জঙ্গলে ঢুকলেন। এইভাবে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তারা একসময় সাতটি নদের দেশ চাই চাম্পায় এলেন। চাই চাম্পায় বহিরাক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য অনেকগুলি গড় বা দুর্গের পত্তন করলেন এবং কুলহির শেষ প্রান্তে

দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাই চাম্পাও ছাড়তে হল। চাই চাম্পা ছেড়ে তারা তোড়ে পুখরিতে উঠে এলেন। এখানে বহুদিন পর্যন্ত ছিলেন। তোড়ে পুখরি ছেড়ে শিখরভুঁই ছাড়িয়ে সাঁত দেশে এলেন। এই সাঁত এ ছিলেন বলেই এদের সাঁওতাল বলা হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। সবাই সাঁতএ ছিলেন না, কিছু লোক ছিলেন তারা এখনো আছেন। পরবর্তী কালে সাঁত ছেড়ে শিখর ভুঁইএ এলেন। শিখরভুঁইএর মহারাজের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। অবশেষে সেটাও ছেড়ে দিয়ে টুণ্ডি হয়ে সাঁওতাল পরগণায় এলেন। ঘোরবার সময় কোথাও কোথাও দিকুদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। কোথাও তারা জিতেছেন, আবার কোথাও পরাজিত হয়েছেন।

কাহিনীর শেষাংশ সাঁওতাল পরগণা থেকে সংগৃহীত বলেই সাঁওতাল পরগণার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী কেবল সাঁত এবং শিখরভুঁই এর অধিবাসী নন, তারা মানভূম, বরাহভূম, সিংভূম এবং বীরভূমেরও অধিবাসী। তাই তাদেরকে কেবল সাঁত এর অধিবাসী বলে উল্লেখ করা ভুল।

সাঁওতালরা ছিলেন কৃষিজীবী। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারক এবং বাহক। তাই তাদের যাত্রা পথে যে সব জায়গার নাম উল্লেখিত হয়েছে সেগুলি সবই গ্রামের নাম এবং এই জন্যই ইতিহাসের পাতায় তাদের বিবরণ খুঁজে পাই না, কারণ প্রাচীনকালের ইতিহাসে কেবল মাত্র রাজা, রাজড়া এবং তাদের রাজ্য এবং রাজধানীর নাম লিপিবদ্ধ আছে।

গণনার সাঁওতালি পদ্ধতি

যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পর থেকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা খৃষ্টাব্দ গণনা শুরু করে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাদের পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মদিনা থেকে মক্কা যাত্রার অব্যবহিত পর থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন। এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু তার বহুকাল পূর্ব থেকে বলতে গেলে প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকে সাঁওতালদের মধ্যে দিন, মাস ইত্যাদি গণনার এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তার কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে বাকিটা অবলুপ্ত হয়েছে। এই অবলুপ্ত হবার কারণ সম্পর্কে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক মার্টিন ওরাঙ্গের মতে নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে হিন্দু সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া। তাঁর মতে তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছে খুব সম্ভব ১৮৫৫

খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে পরাজিত হবার ফলে তারা হিন্দু সংস্কৃতিকে উন্নত মনে করে আপন করতে শুরু করে। ফলে, নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত উন্নত সংস্কৃতি অবলুপ্ত হতে থাকে। সামান্য যা কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে তাই এখানে উল্লেখ করব।

বছরে একবার পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একথা আজ প্রমাণিত। সাঁওতালি ভাষায় বছরকে বলে সেরমা। যেমন মিৎসেরমা বার সেরমা ইত্যাদি অর্থাৎ একবছর, দুবছর ইত্যাদি। সাঁওতালি এই সেরমা শব্দের মধ্যেই যতসব বৈজ্ঞানিক রহস্য লুকিয়ে আছে। কারণ সেরমা বলতে যেমন বছরকে বোঝায় অপরদিকে আবার তেমনি সেরমা বলতে পৃথিবীকেও বোঝানো হয়। যেমন অৎ (মাটি), সেরমা (পৃথিবী)। সাঁওতালি ভাষায় সেরমা কে নিয়ে রচিত নিম্নে প্রদত্ত গানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

বাহা সেরেঞ
হেঁসাঃকমা চটেরে
তুদেদয় রাগে কান,
বাড়েমা লাড়েরে
গুতরুৎমেদয় সাঁহেদ।।
দেশচ আচুরেন
তুদেয় রাগে কান,
দিশমচ বিহুরেন
গুতরুৎ দয় সাঁহেদ।।
বুড়ো অশ্বত্থের মগডালে
কাঠ ঠোকরা ডাকে।
সিংহ ডাকে থেকে থেকে
বট বৃক্ষের ফাঁকে।।

আগমনীর আগমনে
পুরাতনের অবসানে
কাঠ ঠোকরায়, কাঠ ঠকরায়।
বছর এল ঘুরে ফিরে
সিংহ ডাকে তাই।।

(সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর মোট সময় লাগে ৩৬৫ দিন অর্থাৎ একবছর। এখানে বিশেষভাবে যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হল আচুর, বিন্দুর (আচুরেন, বিহূরেন) এর অর্থ হচ্ছে ঘুরে ফিরে আসা। অনুরূপভাবে দেশ এবং দিশমও একটাই শব্দ।)

পাখির কূজন আর সিংহের আর্তনাদে তারা বুঝত পুরাতনের অবসানে নতুনের আগমন। আলোচ্য গানে বছরের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার কথা)

(গানটি গুরু মাদরাজ মাণ্ডির কাছ থেকে সংগৃহিত)

বছরকে যেমন মাসে ভাগ করা হয়, অনুরূপভাবে সেরমাকেও চাঁদয় ভাগ বা বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সাঁওতালিতে চাঁদ বা মাসের গণনা হয় চাঁদ (Chando) অনুসারে। এই কারণেই সাঁওতালি ভাষায় মাসকে চাঁদ বলা হয়। মাস এবং চাঁদ এক নয়। এক মাসে যে দুটো পক্ষ, শুক্ল এবং কৃষ্ণ পক্ষ চাঁদের হিসেবে যারা মাস গণনা করেন তাদের কাছে এটা যে অজানা নয়। তা আলাদা করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতি যে কত নিঁখুত ছিল সেটা বোঝাবার জন্য আমি একটাই মাত্র উদাহরণ দেব। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বৈশাখ পূর্ণিমায় প্রতি বছর শিকার উৎসব পালিত হয়। অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সব আদিবাসী (সাঁওতালরা ছাড়াও এখানে অন্যসব আদিবাসীরা অংশগ্রহণ করে) ছড়িয়ে আছে তাদের অনেকেই ঐ নির্দিষ্ট দিনে সেখানে সমবেত হয় এবং শিকার (সেন্দরা) উৎসব সংঘটিত করে। আজকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, পাঁজি, পুঁথি ইত্যাদি হয়েছে তাই আজকে এই মুহুর্তে সেটা অনেক সহজ মনে হয়, কিন্তু শিকার উৎসব কি আজকের? বহুকাল পূর্বের। যখন আদিবাসীরা চাঁদ দেখেই দিন ঠিক করে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হয়ে শিকার উৎসব উদযাপন করে আসছে। তার অন্যথা হয়নি। অতএব এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল নিখুঁত।

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় Tourist Spot হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম কিনে নিয়েছে। পশ্চিমবাংলার সরকার পাহাড়ের উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে সি, এ, ডি, সির (Comprehensive area development corporation) মাধ্যমে। এ ছাড়াও সরকার অযোধ্যা পাহাড়ে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে এবং জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে বলে জানি। সম্ভবত লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিসই সর্বপ্রথম অযোধ্যা পাহাড়ে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করে। শুনেছি, কিন্তু কতদূর সত্য জানি না, লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস অযোধ্যায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করবার আগে পর্যন্ত সেখানকার লোকজন ভালো পোশাক পরা লোকজন দেখলেই দরজা বন্ধ করে জঙ্গলে গা ঢাকা দিত।

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার দুটো রাস্তা আছে। একটা আড়শা থানার সিরকাবাইদ হয়ে এবং অপরটা ঘুরপথে বলরামপুর থেকে বাঘমুণ্ডি হয়ে অযোধ্যা পাহাড়।

একসময় বাঘমুণ্ডি থেকে পাহাড়ের পথ বেয়ে চুড়ায় ওঠবার জন্য মিনিবাস চালাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে কি কারণে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। কলকাতা থেকে অনেকেই অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে আসে। তারা পুরুলিয়া রেল স্টেশনে অবতরণ করে জীপ অথবা অন্য কিছু ভাড়া করে সিরকাবাইদ হয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে যায়।

জনশ্রুতি যে, রাজা দশরথের জ্যৈষ্ঠপুত্র রাম যখন তাঁর ভাই লক্ষণ এবং সীতাকে নিয়ে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন তখন পুরুলিয়ার এই অযোধ্যা পাহাড়েও কিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তার নিদর্শন হিসেবে এখনো কিছু কিছু দর্শনীয় অবশিষ্ট আছে। যেমন সীতার চুল। সীতা যখন চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতেন তখন যে চুলগুলো মাথা থেকে খসে পড়ত সেগুলো তিনি আশপাশের গাছের ডালে গুঁজে দিয়েছিলেন। সেই চুল নাকি অযোধ্যায় এত বছর পরেও অবশিষ্ট আছে! আর আছে সিমেণ্ট বাঁধানো বুজে যাওয়া একটা কুয়ো। সেই কুয়োয় নাকি শিকারে অংশগ্রহণকারী অনেকেই এক নিশ্বাসে মাটি তুলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, অথচ তার গভীরতা এমন কিছু নয়। অযোধ্যায় গ্রাম আছে মানুষজনও আছে। তারা হেঁটে পাহাড় থেকে নীচে নেমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে পাহাড়ে উঠে যায়। কিন্তু যেখানে কুয়ো আছে তার আশেপাশে কোন লোকালয় নেই। এই কারণেই কুয়োর রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তবে চুল বলে যেটাকে মনে করা হয় সেটা চুলের মতই দেখতে সরু পাতলা একধরনের লতানো শেকড়। আশ্চর্যের মধ্যে আর আছে মজে যাওয়া একটা পাহাড়ী নদী যার জল শিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হলেও এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ শিকারে 'অংশগ্রহণ কারীরা জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নদীর বালি সরিয়ে জল বার করে উপরের নোংরা জল হাত দিয়ে তুলে ফেলে দেয় যার ফলেই নদীতে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত সব পুরুষেরই শিকারে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। যারা বিবাহিত তারা শিকার যাত্রার পূর্বে তাদের পত্নীদের হাতের নোয়া খুলে নিয়ে যায়, শিকার শেষে যে বাড়িতে ফিরে আসবেই তার কোন গ্যারাণ্টি বা নিশ্চয়তা নাই। শিকারীরা পূর্ণিমার আগের দিন পাহাড়ের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে রাত্রিযাপন করে। সকাল হলেই শিকার শুরু করে। শিকারে সাধারণত তীর, ধনুক, বল্লম, তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দড়ি দিয়ে তৈরি জালও শিকারে ব্যবহার করা হয়। শিকার শেষে সবাই সুতানটাঁডিতে এসে জড়ো হয়। এখানে গাছপালা

থাকলেও জঙ্গল নাই। মাঠ। এখানে রান্নাবান্নার আয়োজন করা হয় এবং শিকারে বধ করা প্রাণীর মাংস কেটে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়, কারণ এটাই নিয়ম। ভাগের রকমফের আছে। তবে শিকারে সংগৃহীত প্রাণীর মাংস একলা কেউ খায় না। রান্নাবান্না করে খেতে খেতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। তখন আকাশে পুর্ণিমার চাঁদ ওঠে। চাঁদের আলোয় পৃথিবীর সব অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হয়ে উঠে। শিকারে অংশগ্রহণকারীদের মনেও আনন্দের দোলা জাগায়। তাই খোলা আকাশের নীচে নাচগানের আসর বসে। তবে নাচগানে আদি রসাত্মক বিষয় সমূহকে পরিবেশন করা হয়। তার কারণ সম্বন্ধে অনেকেরই বক্তব্য হচ্ছে যে, তথাকথিত সভ্যদের মধ্যে যৌনশিক্ষার জন্য কামসূত্র, কোকশাস্ত্র ইত্যাদি বই আছে। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে এই ব্যবস্থা নেই। তাই আদিবাসী যুবকদের যৌনশিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্যই এই ব্যবস্থা। অন্য আর এক দলের মতে এইসব অশ্লীল নাচগান হালের ব্যাপার। আদিতে নাকি এদের বালাই ছিল না। সব দিক খতিয়ে দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ নারীবর্জিত পাঁচজন পুরুষমানুষ যেখানে সমবেত হয় সেখানে এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। শিকারের জন্য আলাদা গান আছে যেটা উপযুক্ত জায়গা ছাড়া অন্যত্র গাওয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এসব নাচগানে একসময় রড়ে ক্ষেতুর খুব নাম ছিল। বর্তমানে অনেক দল গজিয়ে উঠেছে তবে রড়ে ক্ষেতুর সমকক্ষ এখনো পর্যন্ত কেউ হয়ে উঠতে পারেনি।

এ তো গেল শিকার উৎসবের একটা দিক এর অন্য আর একটা দিকও আছে। সেটা হচ্ছে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য তৈরি করা হয়েছে আদালত বা বিচারালয়। পাশাপাশি মাটির হাঁড়ি কলসি রাখলে যেমন ঠোকাঠুকি লাগতেই পারে তেমনি সমাজে, গ্রামে পাড়া প্রতিবেশী একসঙ্গে বাস করতে গেলে মানুষে মানুষে লড়াই ঝগড়া লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য সাঁওতালদের প্রতি গ্রামেই আছেন মাঝি বা মোড়ল। বিবাদ দেখা দিলে তারা গ্রামের সবাইকে নিয়ে বিচারে বসেন এবং বিবাদের ফয়সালা করে থাকেন। কিন্তু কোনো বিবাদ যদি অমীমাংসিত থেকে যায় তখন ডাক দেওয়া হয় প্রতিবেশী পাঁচ দশটা গ্রামের মাঝিদের। তারাও যখন ব্যর্থ হয় তার নিষ্পত্তি হয় এই দিহরি বিচার সভায় অর্থাৎ শিকার উৎসবে যাকে উচ্চতর আদালত বলা যেতে পারে।

আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা অবসর বিনোদনের জন্য দলবল নিয়ে শিকারে যেতেন। জনসাধারণের অংশগ্রহণ তাতে নিষিদ্ধ না হলেও তাদের দেখতে পাওয়া

যেত না। কিন্তু সাঁওতালদের সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ এই শিকার উৎসব। এই উৎসব তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ ধরে যা বললাম আশা করছি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা বোঝাতে পেরেছি অর্থাৎ তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে তারা দিন, তারিখ এবং মাসের কথা বলে দিতে পারতেন। মাসকে আবার দিনে ভাগ করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় তাকে বলা হয় মাহা। তবে আমার মনে হয় সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে যে মাহা প্রচলিত আছে তা সাম্প্রতিক কালের, পূর্বে যা প্রচলিত ছিল অব্যবহারের ফলে তা অবলুপ্ত হয়েছে। কারণ এই মাহার কথা সাঁওতালদের সবাই জানে না। এটা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ইদানীং লক্ষ করছি সাঁওতালদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অতি উৎসাহী বা কট্টরপন্থীদের মধ্যে সব কিছুকেই সাঁওতালি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যাতে আমার সায় নেই।

গণনার ক্ষেত্রেও সাঁওতালদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। যেমন মিৎটাং, বারয়া, পেয়া, পুনয়া, মড়ে তুরুই, এয়ায়, ইরাল, আরে, গেল (অর্থাৎ, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় এবং দশ) ইত্যাদি। এইভাবে কুড়ি বা বিশ পর্যন্ত গণনার পদ্ধতি আছে। কুড়ি বা বিশটাই হচ্ছে সাঁওতালদের সর্বোচ্চ সংখ্যা। সাঁওতালরা কুড়ি বা বিশকে বলে ইসি বা মিৎইসি। এইভাবে মিৎ ইসি মিৎ, বারয়া, পেয়া বললে সাঁওতালরা সহজেই বুঝতে পারে যে, কি বলতে চাইছে বা কত বলতে চাইছে। এইভাবে চল্লিশের বদলে বার ইসি, ষাটের বদলে পে ইসি, আশির বদলে পুন ইসি এবং একশর বদলে মড়ে ইসি বললে সাঁওতালরা মোটেই বিভ্রান্ত হয় না। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে আমি এখানে নমুনা হিসাবে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতালদের বিদ্রোহের ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। সাঁওতালরা যখন নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে নিয়ে যেত মহাজন তা মেপে নিতেন। কিন্তু যত দ্রব্যই নিয়ে যাক না কেন মহাজন কোন দিনই বিশ কথাটা বলতেন না। তখন সাঁওতালরা মহাজন বাবুকে অনুরোধ করত 'বিশ বোল বাবু বিশ বোল।' কিন্তু মহাজন বাবু বিশ আর কোনোদিনই বলতেন না। তবে এখানেও ছয়ের পর থেকে উনিশ পর্যন্ত গণনার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা কতটা সাঁওতালদের নিজস্ব সেই নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে বাকিটা অবশ্যই সাঁওতালদের সম্পূর্ণ নিজস্ব এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। আধুনিককালে গণনার যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে সেটা সাম্প্রতিক কালের। কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি তখনকার পরিস্থিতির বিচারে অবশ্যই যুগান্তকারী বা বিপ্লবাত্মক।

নারী, পুরুষের সহযোদ্ধা

সাঁওতাল সমাজে নারীর স্থান কোথায়? সেই আলোচনায় যাবার আগে আমি ছোট্টো অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। অনেকদিন আগের ঘটনা, আমি তখন খুব ছোটো তাই তখন সেই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারিনি। কিন্তু এতদিনে সেটা বুঝতে পেরেছি। পশ্চিমবাঙলায় তখনো বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসে নি, ক্ষমতায় আসার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে দেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীনতার আলো সাধারণের পর্ণ কুটিরে প্রবেশ করেনি, তাই, "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগানও উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাঙলা গণ আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। অনেকেই সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। আমার বাবা এবং কাকাও তাদের অনুসরণ করে কমিউনিষ্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। সেই সূত্রেই আমাদের মাটির বাড়িতে কমিউনিষ্টদের আনাগোনার সূত্রপাত (তখন কমিউনিষ্টরা পরষ্পর পরষ্পরকে আত্মীয় জ্ঞান করতেন, যাওয়া আসাও করতেন)। আমাদের অবস্থা তখন এমন কিছু ছিল না যে, তাদের জন্য আলাদা কিছু করব, তাই আমরা যা খেতাম ওরাও তাই খেত, আমাদের মতই মাটিতে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ত।

সাম্যবাদ নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হত, বিতর্কও হত। সেই আলোচনার অংশবিশেষই এখানে তুলে ধরছি। একজন পার্টি কমরেড আমার বাবা দীনবন্ধু টুডু এবং কাকু টিকারাম বাস্কেকে বোঝাচ্ছেন, আমরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই সাম্যবাদ কাকে বলে জানা দরকার। কিন্তু তার জন্য রাশিয়া কিম্বা চীনে যাবার দরকার নাই। আমাদের চারপাশে যে সব সাঁওতালদের বসবাস আছে সেখানে গেলেই হবে। আমাদের চারপাশে যে সব সাঁওতাল গ্রাম আছে সেখানে গেলেই সাম্যবাদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে। সাঁওতাল নারী পুরুষকে দেখলেই সাম্যবাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি তিনি যদি সাধারণ কমরেড না হয়ে অসাধারণ কেউ হতেন অথবা বিখ্যাত কেউ হতেন তবে নিশ্চয় তার এই কথা খবর কাগজের হেডলাইন হত। কারণ তিনি যেটা বলেছেন সেটা কথার কথা নয়। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাঁওতাল সমাজে নারীর স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি কেবল পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী, সন্তান উৎপাদন এবং লালন পালনের যন্ত্র নন, তিনি দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের বা লড়াইয়ের ময়দানের সহযোদ্ধা। সর্বত্রই নারী পুরুষের পাশে থেকে পুরুষকে উৎসাহ যুগিয়ে আসছে। তথাকথিত সভ্যরা যখন নারীকে ঘরের চার দেওয়ালে বন্দী করেছে, আপদমস্তক কাপড়ে মুড়ে অনেকটা কাপড়ের পুঁটুলির

মত করে বাইরে এনেছে তখন সাঁওতাল নারীকে অর্গল মুক্ত করে দিয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার নামে যা কিছু করা এক নয়। নারী আর যাই হোক তার কাছে সে বাজারের সস্তা কোনো পণ্য নয়। তাই নারীর মর্যাদা, সম্ভ্রম তার কাছে মূল্যবান। তাকে রক্ষা করতে সে সর্বদাই তৎপর। এ সম্বন্ধে সাঁওতালদের পুরাণে উল্লেখিত এক পৌরাণিক কাহিনীর অবতারনা করব।

সাঁওতালরা তখনো স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেনি। যাযাবরের মত জীবন যাপন করছে। এক জায়গায় কিছু কাল অবস্থান করার পর অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা চাই চাম্পায় এসে পৌছাল। জায়াগাটা তাদের পছন্দ হল। মনোরম পরিবেশ তাদের আকৃষ্ট করল। তাই বসবাসের উপযোগী করে তোলা হল। সম্ভাব্য বহিরাক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁরা অনেকগুলি গড় বা দুর্গের পত্তন করলেন। তারা এখানে সুখেই ছিলেন। কিন্তু সেই সুখ তাদের সইল না। তাই চাই চাম্পার মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হল। কিস্কুরা ছিলেন তাদের রাজ্যের মহারাজা। তাঁর ছিল এক আদরের কন্যা, আলালের ঘরে দুলাল। তার বিয়ে থা হয়নি। মহারাজ একদিন জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়ে লতাপাতায় ঢাকা এক সদ্যজাত পুত্র সন্তান কুড়িয়ে পেলেন। তিনি সেই সদ্যজাতকে নিয়ে এলেন এবং তাঁর একমাত্র কন্যার হাতে তাকে তুলে দিলেন (আবার কারো কারো মতে সেই পুত্র সন্তানের জন্মদাত্রী মহারাজেরই আদরের একমাত্র কন্যা। অবিবাহিত ছিলেন বলেই তাকে কুড়িয়ে পাওয়া বলে পরিচয় দিলো)। তাকে পেয়ে রাজকন্যা আহ্লাদে আটখানা। পরম স্নেহে কোলে পিঠে করে তাকে বড় করতে লাগলেন। তার নাম দিলেন মাধো সিং। এই মাধো সিং যখন বড় হলেন, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তার বিয়ে করার ইচ্ছে হল, কিন্তু যেহেতু তার বংশ পরিচয়ে গণ্ডগোল ছিল তাই কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হল না। কথাটা মাধো সিং রাজার কানে তুললেন এবং বলে দিলেন কিছুদিনের মধ্যে যদি তার বিয়ে না হয় তবে সে রাজ্যের সমস্ত যুবতী মেয়ের মাথায় সিঁদুর ঘসে তাদের সতীত্ব নষ্ট করে দেবে। মহারাজ সমাজপতিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজতে ব্যর্থ হলেন, তাই ঠিক হল মাধো সিংকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে চাই চাম্পার মায়া ত্যাগ করে সবাই চলে যাবেন। তাই হল। তারা চাই চাম্পা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। মাধো সিং পরে এ কথা জানতে পেরে তাদের পিছু নিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এতদূরে চলে এসেছিলেন যে, মাধো সিং আর তাদের নাগাল পান নি। নারীর সম্ভ্রম সাঁওতালদের কাছে মূল্যবান। তার জন্য তারা সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু নারীর সম্ভ্রম কোনো কিছুর বিনিময়েই বিসর্জন দিতে পারে না। সতীদাহর মত

জঘন্য প্রথা ভারতবর্ষে একসময় ছিল। কুলীনদের কৌলিন্য বজায় রাখার জন্য মৃত্যুপথ যাত্রীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মৃত স্বামীর চিতায় তুলে মেয়েকে সহমরণে বাধ্য করা হত। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়নের উপযোগিতা অনুভব করে সতীদাহ আইন প্রণয়নের দাবী জানান। কিন্তু সতীদাহ নিবারণের জন্য আইন প্রণীত হলেও সতীদাহ নিবারণ হয় নি, তাই রূপ কানোয়ারদের এখনো সহমরণে যেতে হয়।

নারী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া সমাজ উন্নত হতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না। তাই যে কোনো ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ স্বাগত। হাটে বাজারের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। পুরুষ হাটে বেরিয়েছে স্ত্রী তার সঙ্গে, মেলায় চলেছে বউ তার পাশে। স্বামী মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে তার বউ ধানের চারা তুলছে, লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গেলে সেখানে ধানের চারা পুঁতবে বলে। তাদের অংশগ্রহণ এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের উপস্থিতি সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে। ইটভাঁটায় অথবা গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্রে মাঠের ধু ধু প্রান্তরে তারা পাশাপাশি জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। তারপরে দিনান্তে কাজের শেষে মাঝি আখড়ায় গিয়ে মরদ নাগড়া মাদল কাঁধে নিয়েছে আর তার বউ হাতে হাত ধরে গান ধরেছে, কোমর দোলাতে শুরু করে দিয়েছে। সমাজে নারী তার নির্ধারিত আসনে অবস্থান করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন একবার কোনো এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অমিতাভ চৌধুরির ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি তাঁর ভাষণে খেদোক্তি করে বলেছিলেন, বাঙালীর সংস্কৃতি খুব বেশি দিনের নয় এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করার মত বিশেষ কিছুই নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমল থেকেই বাঙালীর সংস্কৃতির সূত্রপাত। তথাকথিত সভ্যদের কাছে নারীর নাচগানে অংশগ্রহণ সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হত। কেবল তাই নয় সমাজপতিরা অংশগ্রহণকারীকে সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করতেন। অন্যদিকে সাঁওতালি সমাজে নাচে গানে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নাচগানের আখড়া বা আসর অধরা থাকে।

পৃষ্ঠপোষক ছাড়া কোনো সংস্কৃতিই উন্নত হতে পারে না। নিছক ভালোবেসে সংস্কৃতির চর্চা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। হিন্দি বাংলার এত রমরমার পেছনে আছে রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। একসময় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলেই হিন্দি এবং বাংলা এত উন্নত হতে পেরেছে। দেরিতে হলেও পশ্চিমবাংলার সরকার এটা বুঝতে পেরেছেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছেন। যদিও সেটা প্রয়োজনের তুলনায় যৎ সামান্য। হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সংস্কৃতির পেছনে যে পরিমাণ টাকা ঢালা হয় সাঁওতালির পেছনে

তার ভগ্নাংশও খরচ করা হয় না। ইদানীং আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষায় সম্প্রচারের ব্যবস্থা হলেও অবস্থার তেমন কিছু হেরফের হয়নি। কারণ এখানে যারা কর্মরত তারা কেবল অযোগ্যই নয়, অপদার্থ। এদের কারা নির্বাচিত করে? এখানে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাই বা কী? কে জানে! সাঁওতালি অনুষ্ঠানের বয়স ত কম হল না কিন্তু তারা কি দাবী করতে পারবে, অমুক শিল্পী আমাদের সৃষ্টি। অথচ সরকারের কাছে কিম্বা কেন্দ্র অধিকর্তার কাছে দাবী জানালে তারা বলবে, কেন? আমরা ত সময় বরাদ্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ বরাদ্দ করেই তাদের দায়িত্ব শেষ, তারা হাত পা গুটিয়ে বসে পড়েছেন। এইভাবে সীমাহীন বঞ্চনা ও অবহেলার ফলে সাঁওতালদের কিছু কিছু Traditional, ঐতিহ্যমণ্ডিত নাচগান ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে, যেগুলো অবশিষ্ট আছে তাদের অবস্থাও ভালো নয়, তারাও পা বাড়িয়ে রেখেছে। সেদিন হয়ত আর বেশি দূরে নেই যেদিন সাঁওতালদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকে জানতে হবে ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে অথবা আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রোগ্রামের মারফতে বাড়ির ড্রইংরুমে বসে। একজন সংস্কৃতি প্রেমী হিসেবে কথাটা ভাবতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

সামাজিক অনুষ্ঠান

নিত্যদিনের একঘেয়েমি জীবনে বৈচিত্র আনার জন্যেই মেলার পরিকল্পনা বা পালাপার্বণের সূচনা। আজকে এই একবিংশ শতাব্দীতে বিনোদনের কত রকমের উপকরণই না প্রত্যেকটা পরিবারেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুদূর অতীতে এসব ছিল না। তখন মানুষের জীবনে মেলাই ছিল সব। মেলাকে সাঁওতালি ভাষায় বলে পাতা। মেলা বলতে যেমন বোঝায় অসংখ্য বা অনেক, পাতা বলতেও তাই। মেলা বলতে যেমন অসংখ্য লোকের সমাগমকে বোঝায়, পাতা বলতেও তেমনি বোঝায় এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে সহজে কারওর পাতা বা হদিশ পাওয়া সহজ নয়। সাঁওতালদের প্রায় সব পাতাই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক অর্থাৎ গ্রামকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হত বিনোদনের জন্য অনুষ্ঠান। এবং এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত করার বিধান থাকায় নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে কেউ খুব একটা যেতেন না। নিমন্ত্রিতদের কথা আলাদা, তাদের কথা বাদ দিলে আমজনতার অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে।

৩৬৫ দিনে মিৎ সেরমা বা এক বছর। গণনার সুবিধার জন্য সেরমাকে বারো মাস বা চাঁদয় ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল চাইত, বাইশাখ, ঝেট, আসাড়,

শান, ভাদর, দাঁশায়, সহ্রায়, আঁঘাড়, পুস আর ফাগুন। সূর্যের দিক পরিবর্তনের ফলে বারো মাস একরকমের হয় না। কখনো বেজায় রোদ লাগে আবার কখনো প্রচণ্ড শীত, তাই বারোটা মাসকে ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। বাংলায় ঋতুর সংখ্যা ছয় যেমন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত। কিন্তু ইংরেজীতে 'ঋতুর' সংখ্যা চার। সেগুলি হল, (Summer) গ্রীষ্ম, (Rainy) বর্ষা, (Autumn) শরৎ এবং (Spring) বসন্ত। সাঁওতালী ভাষায় মাস এবং দিনের মত 'ঋতুর ও নিজস্ব নামকরণ আছে। তবে সাঁওতালি ভাষায় বাংলার মত ছয় ঋতু নেই, আছে ইংরেজীর মত চারটে ঋতু। আমি এখানে তিনটের কথা উল্লেখ করলাম একটার কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না তাই উল্লেখ করলাম না। পরে নিশ্চিত হলে তারও উল্লেখ করব। সেই ঋতুগুলি হল নিরন (গ্রীষ্ম), জাপুৎ (বর্ষা) এবং রাবাং (শীত)। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও পরিবর্তন আসে তাই মানুষের ভাষা, গানের সুর পালটে যায় বলেই বারো মাসে তেরো পার্বন অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রথমে দুটো মূল অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে অন্যদের কথা বলব। সেই দুটোর একটা হল সহ্রায় এবং অন্যটা বাহা। প্রথমে আসছি সহ্রায় পরবের কথায়। সাঁওতাল পরগণার কথা বাদ দিলে সাঁওতালি সহ্রায় বঙ্গা বা কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই মহোৎসব সংঘটিত হয়। নীচে উল্লেখিত সহ্রায় গান সে কথাই সমর্থন করে :

নি চাঁদ কুনামী
দারায় চাঁদ আসাবাইশা।
হাতি লেকান সহ্রায় দাই না সেটেরেনারে।

(গানটির রচয়িতা সম্ভবত গোমস্তা প্রসাদ সরেন।)

সাঁওতালদের সমাজ জীবনে সহ্রায় পরবের গুরুত্ব যে কতখানি তা এই দু লাইনের সহ্রায় সেরেঞ (গান) থেকে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে সহ্রায় পরবকে হাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতি যেমন সবার বড়, তেমনি সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ ত আছেই—দং আছে, কারাম, লাঁগড়ে, ডাণ্টা রিনঝা আছে। এছাড়া আরো অনেক আছে কিন্তু সহ্রায়?—তার গুরুত্বই আলাদা।

হেমন্তের নীল আকাশে বর্ষার ঘনঘটা থাকে না। মাঠের চতুর্দিক তখন সবুজ চাদর দিয়ে মোড়া থাকে। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশির সকালে সূর্যের আলোয় চিক চিক করে ওঠে আর ঠিক তখনই সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে মাদলের ধিতাং তিং আর নাগড়ার দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি সবাই মাদলের তালে তালে হাতে হাত জড়িয়ে কোমর দোলাতে থাকে আর সুর করে গাইতে থাকে :

বারো বছর সহরায় আয়ো
গ(অ)চ সারেচ জিউঙ্গতিঞ
কুলহি দাঁড়ান দগ আয়ো
আলম মানাঞা।

(প্রচলিত)

বছর দিনের সহরায় পরব মাগো
বাঁচা মরা জীবন মোর গ্রামের রাস্তায় যেতে মাগো
বারণ কর না।

হ্যাঁ। সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবন দর্শন এটাই। মাত্র কটা দিনের ত জীবন। তার মধ্যে আবার অসুখ বিসুখ আছে। অতএব মানুষে মানুষে বিভেদ নয়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি নয়। খাও, পিয়ো আর মোজ ওড়াও। এই সঙ্গে স্মরণ যোগ্য এই গানটা।

রাহা-দং
জম আবন, ঞুই আবন
রা(ই)স্কা রেবন তাঁহেনা
নওয়া হাসা হড়ম বারসিঞ লাগিৎ।।

(প্রচলিত)

খাব দাব স্ফূর্তিতে থাকব
এই মাটির দেহ দুদিনের জন্য।।

পাঁচ দিনের উৎসব সহরায়। কালীপুজোর দিন এই মহোৎসবের শুভ সূচনা হয়। তবে কালীপুজোর সঙ্গে সহরায়ের মৌলিক পার্থক্য আছে। উদ্বোধনের দিন গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ি থেকেই মুঠো চাল ও একটি করে মুরগী সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত হয়ে গেলে ছেলে বুড়ো সবাই গ্রামের শেষ প্রান্তে গ্রামের পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে জড়ো হয়। সেখানে পুরোহিত মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে মুরগি উৎসর্গ করেন। তারপরে মুঠো চাল দিয়ে উৎসর্গীকৃত মুরগীদের খিচুড়ি রান্না করা হয়। সেই খিচুড়ি উপস্থিত সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা হয়। বয়স্করা হাঁড়িয়াও পান করে। পুজো সমাপ্ত হয়ে গেলে সমবেতদের মধ্যে একদল পুরোহিতকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এবং অন্য দল মাদল এবং নাগড়া নিয়ে গোয়ালের গরু জাগাতে চলে যায়। স্থানীয় ভাষায় এদের ধেঁগুয়ান বলে। এরা প্রত্যেকটা বাড়িতে যায় এবং গোয়ালঘরের সামনে অহিরা গান পরিবেশন করে :

আশ্বিন যাইতে
কার্তিক পড়ইতে বাবু হো

আজই তো লাগো গেল
আমাবস্যার রাত।
না কাঁন্দ, না খিজ
সিরমনি গাইয়া গো
তোরী গুলিন দেয় ত দুবো ধান।।

(গানটি প্রচলিত এবং স্থানীয় কথ্য ভাষায় রচিত। জলধর কর্মকারের সৌজন্যে)

বিনিময়ে এরা বাড়ির মালিকের কাছ থেকে সামান্য কিছু পয়সা এবং যদি থাকে তবে গুঁড়ির তৈরি পিঠে পায়।

গ্রামের পুরোহিত এই পাঁচদিনের উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনের দিন কোনো নাচগান হয়না। সেদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেবল অহিরা গান পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় দিন থেকে ঐ যে শুরু হয় নাচ গান, উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত সেটা মোটামুটি অব্যাহত থাকে। এই চারটে দিন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এই কটা দিন নাওয়া, খাওয়া ভুলে সবাই গ্রামের রাস্তায় পড়ে থাকে। তখন ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে একবার গ্রামের রাস্তা ধরে উপরে উঠে যায় আবার নাচতে নাচতে নীচে নেমে আসে। উৎসবে হয়ত কারো গায়ে নতুন কিছু ওঠে আবার অনেকের গায়ে ওঠে না কিন্তু তার জন্যে আনন্দে কোন ভাঁটা পড়ে না।

ঠিক কতদিন আগে সহরায় পরবের সূচনা হয়েছিল সেটা বলা মুস্কিল। সহরায় সম্বন্ধে কথিকাগুলি থেকে জানা যায় যে :

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কৃষিকাজই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মূল উপজীবিকা। এই কৃষিকাজের ক্ষেত্রে আবার গরু মহিষের অবদান ছিল অপরিসীম। ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে জল সেচের ব্যবস্থার সরকারি প্রচেষ্টাও তখন ছিল না। তখন আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টির জলে গরু মহিষের লাঙ্গল দিয়ে কৃষিকাজ হত। এর ফলেই মাঠে সোনা ফলত। চাষীর ঘরে গোলাভর্তি ধান উঠত। কৃষিকাজে গরুমহিষের এই অসীম অবদানের কথাই বছরের কটা দিনে স্মরণ করা হয়।

সহরায় সম্বন্ধে প্রচলিত আর একটি কথিকা থেকে জানা যায়।

সাঁওতালরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবার আগে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত। ঘুরতে ঘুরতে তারা সপ্তসিন্ধুর দেশ চাই চাম্পায় উপস্থিত হল। এই চাই চাম্পায় অবস্থান কালে তাদের মহারাজা আদেশ জারি করলেন যে, মেয়ে জামাই, ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে বছরে একবার নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। মেয়ে জামাই, ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে নেমন্তন্ন করতে করতেই অনেকটা সময় কেটে গেল এবং

কালক্রমে এই উৎসবটাই সহরায় রূপান্তরিত হল এবং এটা চাষীর গোলায় ধান উঠে যাবার পর অনুষ্ঠিত হতে লাগল।

এ প্রসঙ্গে ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টারের কথা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য :

'The santal rejoices and sacrifices to his gods when he commits the seed to the ground (the Ero-Sim festival) when the green blade has sprouted (the Hariar Sim) When the ear has formed (the Horo) gathering of the rice crop forms the occasion of the crowning festival of the year (sohorai)'.

অর্থাৎ, সাঁওতাল যখন মাঠে ধান বোনে দেবতার (এরঃকসিম) উদ্দেশ্যে মুরগী উৎসর্গ করে এবং আনন্দ করে, যখন ধানের চারায় নবোদ্গম (হারিয়াড় সিম) হয় এবং যখন ধান পাকে (হুড়ু), যখন ধান গোলায় তোলে তখন বছরের বড় উৎসব (সহরায়) উদযাপন করে।

তিনি আরো মন্তব্য করেছেন :

'The staple food of the Beerbhoom highlanders in Indian corn (Santali Janora), and three small inferior grains called Janhe, gundli and iri which I have not seen cultivalid by the low land Hindus. The Beerbhoom Santal looks upon rice the universal food of the lowlanders, as rare luxury; but he successfully rears the small hardy barly (bajra) which is common through out Bengal. In the sounthern country, the word Janhe is used to designate a wild grass.''

অর্থাৎ, 'বীরভূমের পার্বত্য উপজাতির প্রধান খাদ্য ভারতীয় শস্য (সাঁওতালি জঁডরা) এবং তিনটি নিকৃষ্ট শস্য যাদের বলা হয় জানহে, গুঁদলি এবং ইড়ি নিম্ন-বঙ্গের হিন্দুর মধ্যে যাদের চাষ আমি দেখিনি। নিম্নবঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চালকে সাঁওতালরা মোটামুটি বিলাস দ্রব্য হিসেবেই দেখে, কিন্তু তারা বার্লির মত ছোট দানা বিশিষ্ট শস্য (বাজরা) দক্ষতার সঙ্গে চাষ করে, যা বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায়। দক্ষিণ দেশে জানহে বন্য ঘাস হিসেবেই পরিগণিত হয়।'

এ কথা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে বাংলায় যাকে নবান্ন বলা হয় সাঁওতালি ভাষার সহরায় নবান্নের অবিকল প্রতিমূর্তি। এবং সহরায় কার্তিক মাসেই অনুষ্ঠিত হবার কথা কারণ উপরোক্ত শস্যগুলি তার আগেই চাষীর গোলায় উঠে যায়। নিম্নে বর্ণিত এল. এস. এস. ও. ম্যালির মন্তব্য আমার আশঙ্কাকেই সত্য বলে প্রমানিত করে :

'In the Santal villages there is a succession of festivals throughout the year, nearly all, connected with agricultural

operations The chief of these is the saharae of harvest festival, celebrated in Pus (December-January) after the rice crop of the tear has been harvesyed. It used to be celebrated in the month of Asin formerly they had gathered their principal crop by that time. The Santals indeed still call Asin the month of Soharae a name probably corrupted from Dasahara.'

অর্থাৎ, 'সাঁওতাল গ্রামগুলিতে সারা বছরই কোনো না কোনো উৎসব সংঘটিত হয়। যাদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাঁওতালদের প্রধান উৎসব সহরায় বা ধান কাটার উৎসব পৌষ-মাঘে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী)-র বছরের শেষে ধান কাটার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এই উৎসব আশ্বিনে তাদের প্রধান শস্য সংগৃহীত হবার পরেই অনুষ্ঠিত হত। সাঁওতালরা সম্ভবত আশ্বিন মাসকে সহরায় চাঁদ বলে ডাকে—যা কিনা দশহরারই বিকৃত রূপ।'

সাঁওতালদের জীবন জীবিকার একটা বড় অবলম্বন ছিল বন জঙ্গল পাহাড় ডুংরি ইত্যাদি। সেখান থেকে কাঠ লতা পাতা এবং দাঁতন সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করত। অপর দিকে জঙ্গলে ছিল বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ। তাই খাবার চিন্তা তাদের ছিল না। বর্তমানে অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামান্য যেটুক জঙ্গল অবশিষ্ট আছে সেখানে জঙ্গল রক্ষার নামে গার্ড, ফরেস্টাররা আছে। তারা ট্রাকের পর ট্রাক মাল রাতের অন্ধকারে পাচার করে দিচ্ছে। সাঁওতালদের বেলায় যত সব বাধা নিষেধ। অরণ্য রক্ষার নামে সাঁওতালদের ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিচ্ছে। মোটা টাকা জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। এতসব বাধা ডিঙিয়ে যারা সামান্য কিছু নিয়ে যাচ্ছে তারা দাম পাচ্ছে না। কারণ এখন লোকে কাঠের পরিবর্তে কয়লা পোড়াচ্ছে। লতা পাতার পরিবর্তে কাগজের ঠোঙ্গা এবং প্লাস্টিক ব্যবহৃত হচ্ছে। দাঁতনের পরিবর্তে ব্রাশ কলগেটের ব্যবহার হচ্ছে। অপরদিকে আবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি জমি সামান্য যা কিছু ছিল তাও মদ হাঁড়িয়া খাইয়ে চালাক লোকেরা ঠকিয়ে নিয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও খুব বেশি কিছু করতে পারেনি। তাই এদের মধ্যে দারিদ্রতা এখন তীব্র আকার নিয়েছে। এই সব কারণে পাঁচ দিনের সহরায় উৎসবকে বর্তমানে নমঃ নমঃ করে কোনো রকমে দু একদিনে পার করে দিচ্ছে।

রেডিয়ো, টিভি এবং সিনেমার দৌলতে লাড়েলাপ্পা সংস্কৃতি এখন সাঁওতাল পল্লীতেও ঢুকে পড়েছে। সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা এখন হিন্দি সিনেমার নায়ক নায়িকাদের অনুকরণ করছে। এখন ছেলেরা মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখছে এবং ঢোলা জামা প্যান্ট পরছে। অপরদিকে আবার মেয়েরাও হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের

অনুকরণ করছে। এইসব ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাচগানের পরিবর্তে হিন্দি সিনেমার সস্তা চটকদারি গান গাইছে আর ঢংয়ে ঢংয়ে নাচছে।

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে পৃথিবী দূরে সরে যায় আবার এক সময় কাছাকাছি চলে আসে বলে পৃথিবীতে দিন রাতের তারতম্য ঘটে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে পৃথিবী সূর্যের খুব দূরে চলে যায় বলে সেদিন দিন সব থেকে বড় হয়। পরদিন থেকে দিন বদলাতে থাকে অর্থাৎ ছোট হতে থাকে। এইভাবে ক্রমশ ছোট হতে হতে পৌষমাসের ৭ তারিখ দিন সব থেকে ছোট হয় এবং রাত্রি বড় হয়। তারপরে দিন আবার ক্রমশ বড় হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে হাড় কাঁপানো শীত বা ঠাণ্ডা কমতে থাকে। ইতিমধ্যে ঋতু পরিবর্তিত হয়। শীত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঋতুর রাজা বসন্তের আগমন ঘটে। অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামগুলির চতুর্দিকে অবস্থিত বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যিক গঠনেও আসে পরিবর্তনের ঢেউ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শরৎ' কবিতার অংশবিশেষ ধার করে বলি :

আমলকী বন কাঁপে যেন তার
বুক করে দুরু দুরু,
পেয়েছে খবর পাতা খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল
টগর ফুটিল মেলা,
মালতী লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছিরা দুই বেলা।।

বসন্তের আগমনে গাছের ডাল পালা থেকে পুরোনো বিদায় নিয়ে নতুন পাতা গজায়, ফুল ফোটে। শাল পলাশের রঙে রাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ফুলের সৌরভ ভ্রমরের গুঞ্জন সাঁওতালদের মনের মণিকোঠায় মদিরতা জাগায় তাই সাঁওতাল পরগণার গ্রামগঞ্জে বাহা (ফুল) অর্থাৎ বসন্ত উৎসবের ধূম পড়ে যায়। দিন ধার্য হয়। তার পরে নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যায় মাঝি রাচা অর্থাৎ পুরোহিতের বাড়ির উঠোনে সবাই জড়ো হয়। সমবেত জনতার মধ্যে থেকে তিনজনকে বাছা হয়। তারা উঠোনে পাতা পাটিয়া বা মাদুরে গিয়ে বসে অর্থাৎ আসন গ্রহণ করে। পুরোহিত তাদের তিনজনের জন্য বেতের বোনা ধামা কুলোয় করে আতপ চাল এবং দুব্বো ঘাস এনে তাদের সামনে রাখে। তারা আতপ চাল এবং দুব্বো ঘাস হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। পুরোহিত তখন তাদের

গায়ে ঘটির ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে তাদের আন্দোলন থামে তবে স্বাভাবিক হয় না। পুরোহিত এক্ষণে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। তাঁরা কেউ মারাং বুরু ত কেউ জাহের এরা আবার কেউ মড়েক তুরুইক বলে পরিচয় দেয়। তাঁদের পরিচয় জানার পরেই পুরোহিত তাঁদের মর্ত্যে আসার হেতু বা কারণ জিজ্ঞেস করে। পুরোহিতের কথায় বঙ্গারা পুনরায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে এবং মর্ত্যে অবতরণের কারণ দর্শায়। এখানে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখনীয় সেটা হচ্ছে গ্রামে যাই কিছু ঘটুক না কেন তার পেছনে কারণ থাকে। কার্যকারণ ছাড়া কোনা কিছুই সংঘটিত হয় না। গ্রামের যারা হর্তা কর্তা বিধাতা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তাদেরই। যদি তারা ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তাহলে কথাই নেই, কিন্তু যদি না নেয় তাহলে তার কৈফিয়ত তলব করে, রীতিমত জবাব দিহি করতে হয়। সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে বলার কিছু নাই। কিন্তু না পারলে পরবর্তী কালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পেলে তবেই মুক্তি। স্বাভাবিক হওয়ার আগে বঙ্গারাই ঐ দিনের জন্য একজনকে কুডাম নায়কে (সহকারী) হবার জন্য ধরে নিয়ে আসে। তারপরেই স্বাভাবিক হয় এবং ভিড় ভাঙ্গে। সাঁওতালদের রীতি নীতি কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়। তাই এটাকে সার্বজনীন বলে দাবী করা বাতুলতা মাত্র। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোনো এক বিশেষ অঞ্চলে এটা প্রচালিত আবার কোথাও কোথাও দেখেছি জনগণ রাত্রে ডিনার খাওয়া দাওয়ার পর মাঝির উঠোনে জড়ো হয়। বঙ্গা বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি করে। উদাহরণ হিসেবে এখানে দু একটির কথা উল্লেখ করছি। গান দুটি গুরু মাদরাজ মাড্ডির কাছ থেকে সংগৃহীত।

রাহা—বাহা

(১) তেহেঞ দব উম আকান হো,
তেহেঞ দব নাড়কা আকান।।
তেহেঞদ নায়কে রাচাবণ,
দুড়ুপ আকান।।
তেহেঞদ নায়কে রাচাবন
সিদুপ আকান।।

(২) নায়কে মায় উম আঁড়গন
সুচ দাঃকরে।
নায়কে এরায় নাড়কা হসর
ডাডি দাঃক রে।।
নায়কে মায় উম রাকাপ এন
সোস ঘাটিরে।

নায়কে এরায় বহেল রাকাপ
মেরাল ঘাটিরে।।
(১) আজ আমরা স্নান করেছি
সাবান দিয়েছি গায়।
কাল নববর্ষরেভাই
জড়ো হয়েছি তাই।।
পুরোহিতের আঙিনায়
আমরা সবাই।।
(২) নায়কে ঠাকুর নাইতে যাবে
সঙ্গে যাবে কে?
পুরোহিতের (নায়কে) পত্নী যাবে
আবার যাবে কে?
স্নান করবে কাপড় ধোবে
কাজল কালো জলে।
কাপড় ছেড়ে উঠবে ঘাটে
সোসঘাট আর মেরাল ঘাটে
নাওয়া ধোওয়া সারা হলে
উঠবে হেলে দুলে।।

এইভাবে ক্রমশ চলতে থাকে। ক্রমে রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। মানুষের কোলাহল একসময় সম্পূর্ণরূপে থেমে যায়। নিস্তব্ধ নিশীথে একসময় বঙ্গারা তড়ে সুতাম বেয়ে ইহ জগতে নেমে আসে। তারা সবাই নিজের নিজের হাতিয়ার হাতে নিয়ে পূজাবেদীর উদ্দেশ্যে ছুটতে ছুটতে রওনা হয়। তাদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত পূজা বেদী পরিদর্শনের জন্য। পরিদর্শন শেষে পুনরায় পুরোহিতের বাড়ির উঠোনে ফিরে আসে। পুরোহিত তাঁদের পা ধুইয়ে দেয় তখন তাঁরা স্বাভাবিক হয়। সমবেত জনতা তখন উঠোন ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, মাদল এবং নাগড়ার তালে তালে নাচ গানে মশগুল হয়ে ওঠে। সকালের অপেক্ষায় থাকে। তারপর একসময় ভোর হয়, মোরগ ডাকে। পুরোহিত তৈরি হয়, আয়োজন শুরু করে। তারও পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে নায়কে বা পুরোহিত ডান হাতে ঘটি জল এবং বাঁ হাতে বেতের বোনা নতুন ধামা কুলোয় পুজোর সামগ্রী নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বাদ্যের তালে তালে মেয়েরা নাচতে নাচতে শোভাযাত্রা সহকারে নায়কে বা পুরোহিতকে পথ দেখিয়ে জাহেরে নিয়ে যায়। জাহেরে পৌঁছেই নায়কে পুজোয় বসেন। পুজোর বেদীতে গোবর দেন, চালের

গুঁড়ি দিয়ে খঁড তৈরি করেন, সেই খঁড়ের ভিতরে বলি দেবার উদ্দেশ্যে আনা মুরগীকে খাওয়াবার জন্য আতপ চাল রাখে। তারপরে মুরগীকে চরিয়ে মারাং বুরু, জাহের এরা এবং মড়েক তুরুইকর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। ওদিকে জাহেরে ভিড় করে থাকা লোকজন নাচগানে জায়গাটাকে আন্দোলিত করে তোলে। সমবেত জনতার মিলিত আওয়াজ এবং বাদ্যযন্ত্রের ঢক্কা নিনাদ গ্রাম ছাড়িয়ে দূরে বহু দূরে চলে যায়। ইতিমধ্যে মুরগি বলি দেওয়া হয়ে গেলে মুরগীর মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হয়, সেই খিচুড়ি উপস্থিত সকলের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়। ততক্ষণে মাঝ আকাশের সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে, অস্ত যায়, তখন পুনরায় ডান হাতে ঘটি জল এবং বাঁ হাতে বেতের বোনা ধামা কুলো নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িতে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির মেয়েরা ঘটিতে করে জল আনে, পিঁড়ি মাটিতে পেতে পা ধুইয়ে দেয় এবং এইভাবে নায়কে একের পর এক বাড়িতে যেতে থাকে এবং বাড়ির মেয়েরা পিঁড়ি মাটিতে পেতে পা ধুইয়ে দিতে থাকে। অবশেষে নিজের বাড়ি পৌঁছোয়। নায়কে এরা অর্থাৎ বুড়ি নায়কে হাড়ামকে পা ধোওয়ার পর বরণ করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। অনুষ্ঠান তখনকার মত এখানেই শেষ। নাচগান সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর পুনরায় শুরু হয় রাত্রে, খাওয়া দাওয়ার পর। তবে ইদানীং বাহা নাচ আর সেরকম ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না, এখন বেশির ভাগ গ্রামেই যেটা হয় সেটা হল লাঁগড়ে, যে লাঁগাড়ের নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নাই। যেটা নাগাড়ে বা লাগাড়ে হয় তাকেই বলে লাঁগড়ে।

বাহা শুরু হওয়ার দিনকে বলে উম। উম নাড়কা অর্থাৎ তেল, সাবান দিয়ে স্নান করা অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। সংস্কৃত ওঁ শব্দের সঙ্গে 'উম' এর কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ যে দিন পূজা পাঠ হয় সেদিনকে বলে 'সারদি' অর্থাৎ জোয়ার। জোয়ারের পরে ভাঁটা তাই শেষ দিনকে বলে বাসকে অর্থাৎ বাসি। এই বাসকে থেকেই বাসকেয়াঃক (Baskeyak) কথাটা এসেছে। যার অর্থ পান্তা ভাত। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে পান্তা খাওয়ার রেওয়াজ সাঁওতালদের মধ্যে আদি থেকেই ছিল। এই বাসকে দিনেই সাঁওতালদের মধ্যে রং খেলার রেওয়াজ একসময় চালু ছিল, এখন সে সব পাট উঠে গেছে। আগেকার দিনে ফুলের নির্যাস দিয়ে রং তৈরি হত এবং রং খেলা হত। এখন বেশীর ভাগ লোকই রং খেলে না, যারা খেলে তারা গোবর গোলা জল, কাদা অথবা হাঁড়ির কালো রং দিয়ে মুখ কালো করে দেয়। 'বাহার' মতন মহৎ উৎসব এখন ভাঁড়ামোয় পরিণত হয়েছে।

সাঁওতালদের সব উৎসবই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক এবং যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাহের। প্রকাশ্য কোনো ময়দানে উৎসবের আয়োজন সাঁওতালদের মধ্যে আদিতেও প্রচলিত ছিলনা এখনো নাই। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সব পাতা বা ছাতা দেখা

যায় তাদের সব কটারই প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাদের বিজাতীয় মুরুব্বিরা। মধ্য যুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের জমিদার, ঘাটোয়াল ইত্যাদি বলা হত। এদের অধীনে নির্দিষ্ট এলাকার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব এরা অধীনস্থ কর্মচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা বিলাস ব্যসনে দিন যাপন করতেন। এদের বিশেষ কিছু কাজ ছিল না, জীবনের সবটাই এদের অবসর ছিল। এইসব সুবিধাবাদী শ্রেণী বিনা পরিশ্রমেই প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন। নাচনী নাচ, বাঈজি নাচের পেছনে দু হাতে পয়সা উড়িয়েও এরা শেষ করতে পারতেন না। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের পাতা এবং ছাতা এদেরই মস্তিষ্ক প্রসুত। এ সব তাদের অবসর বিনোদনের মধ্যেই পড়ে। উদাহরণ হিসেবে শিখর ভুঁই এর অন্তর্গত চাকোলতোড় ছাতা পরবের কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে পশ্চিম বাঙলার বরাহভূম, মানভূম বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছাড়াও সিংভূম থেকে বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে, এখনও হয়। কিন্তু এত সব করেও তাদের মন ভরত না, অবসর বিনোদন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠত না, তাই ছাতা এবং পাতাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলবার জন্য প্রতিবেশী সাঁওতালদের ডাক পড়ল। তারাও অপেক্ষায় ছিল, তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল। ডাক পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বউ, ছেলে মেয়ে নিয়ে মাদল বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে পাতা দেখার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। কিন্তু গোল দেখা দিল এক জায়গায়, তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষক, মুরুব্বি তাদের স্বজাতি নয়, বিজাতীয়। সাঁওতালি ভাষার গান তিনি ত বুঝতে পারবেন না তাই তাকে বোঝাবার জন্য স্থানীয় কথ্য ভাষায় গান রচিত হল। এই কারণেই আগেকার দিনের পাতা এবং লাঁগড়ে গানের অধিকাংশই স্থানীয় কথ্য ভাষায় রচিত। আমি এখানে উদাহরণ হিসাবে দু একটার কথা উল্লেখ করব :

রাহা—পাতা
ই বছর যেমন তেমন
আ(হি)সছে বছর নামাল চলিব।

বাংলা নাবাল থেকেই সাঁওতালি নামাল শব্দের উৎপত্তি। নাবাল কথার অর্থ নীচু জমি। বর্ধমান, মেদিনীপুরের কিছু অংশ, দুই চব্বিশ পরগণার প্রায় সবটাই সমতল ভূমি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ নীচু। পশ্চিম-বঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অর্ধাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুর, অধুনা ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত সিংভূম, সাঁওতাল পরগণার দুমকা অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতালি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন বছরের দুটো মরশুমে বাসে চেপে অথবা গাড়ীতে বোঝাই হয়ে নামালে আসে জন মজুর খাটতে। উপরে উল্লেখিত পাতা

সেরেঞ সেই বাস্তব সত্যকেই তার বিষয় বস্তু করেছে। দুটো মরশুম নামালে কাটিয়ে মজুরি নিয়ে পুনরায় যে যার দেশে চলে যায়। সাঁওতালদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মরশুমে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের নাচগানও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। পাতা নাচ এবং গান কেবলমাত্র পাতা উপলক্ষেই গাওয়া হয় তবে লাঁগড়ের যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো দিন তারিখ নেই, মরশুম নেই তাই মেলায় লাঁগড়ে নাচগান নিষিদ্ধ নয়। আর মেলায় লাঁগড়ে নাচগান হয় বলেই লাঁগড়ের কিছু কিছু গান স্থানীয় কথ্য ভাষায় রচিত। যেমন এই গানটির কথা উল্লেখ করা যায় :

রাহা-লাঁগড়ে
আখাড়া হি গে ধনি
ঝাঁট দে
আখাড়া হিঁ গে ধনি
গোবর দে
আর পাবি গে ধনি এমন সময়?

লাঁগড়ে নাচের জন্য প্রত্যেকটা গ্রামেই আসর নির্দিষ্ট করা থাকে। কিন্তু লাঁগড়ে নাচের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নেই। অবসর পেলেই লাঁগড়ে নাচের আসর বসে তার জন্য উপলক্ষ্যের দরকার হয় না। আবার সাঁওতালদের প্রত্যেকেই বাড়িতে এবং বাড়ির উঠোনে প্রায় দিনই গোবর দিয়ে থাকে। গোবর দিয়ে বীজানুমুক্ত করে। সাঁওতাল লোককবিদের রচিত আলোচ্য লাঁগড়ে সেরেঞ বা গান আমাদের সেই কথাই বলে। রচনার মান বেশ উন্নত। তাই তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকা অনুচিত। তবে, এসব গান এখন অচল। এখনকার ছেলেমেয়েরা এ সব গান গায় না। পরিচর্যার অভাবে যেমন কোনোকিছুই বাঁচে না, এদের অবস্থাও তাই।

সাঁওতালি ভাষা

ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার মূল সম্পদ শব্দ ভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে যত বেশি শব্দ আছে সে ভাষা তত বেশি উন্নত বা সমৃদ্ধ। শব্দের উৎস হচ্ছে তিনটি। সেই উৎস গুলি হল, প্রথমতঃ, মৌলিক বা নিজস্ব। ইংরেজীতে বলা হয় Inherited। দ্বিতীয়তঃ, আগন্তুক বা কৃতঋণ ইংরেজীতে Borrowed বা Loan word এবং তৃতীয় উৎস হচ্ছে। নবগঠিত বা Newly formed, প্রথমতঃ রিকথ রূপে উত্তরাধিকার সূত্রে যে ভাষাগুলি সঞ্চিত হয় তাকে বলা হয় মৌলিক বা নিজস্ব। ইংরেজীতে বলা হয় Inherited. কিন্তু ভাষা তার চলার পথে

রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কে যখন অন্য ভাষার সংস্পর্শে আসে তখন সে বস্তু বা ভাব প্রকাশের জন্য অন্য ভাষার গ্রহণযোগ্য শব্দগুলি নিজের ভাষাভুক্ত করে নেয়। এই সব শব্দ প্রয়োজনের তাগিদে আহৃত বলে এদের আগন্তুক বা ইংরেজীতে বলা হয় Borrowd. সংস্কৃত এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হবার পেছনে সাঁওতালি ভাষার অবদান অপরিসীম। ভাষাবিজ্ঞানীরা বা ভাষাতাত্ত্বিকরা সাঁওতালি ভাষার এই ঋণকে অস্বীকার করেন না বা অস্বীকার করতে পারেন না।

সাঁওতালদের মুখের ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি। সাঁওতালি ভাষাও উপরোক্ত তিনটি উপাদানে গঠিত। তার আত্তীকরণ ক্ষমতা অপরিসীম। কিন্তু তার নিজস্ব বা মৌলিক বা রিকথ রূপে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দভাণ্ডার খুবই উন্নত। সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি এখানে নমুনা হিসাবে ভাব প্রকাশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের (Salient feature) কথা উল্লেখ করব। সাঁওতালি ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস থেকে আমি বিরত থাকব, কারণ আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি, আমি এমন কিছুর কথা বলব যা অন্য কোনো পুস্তকে পাওয়া যাবে না। আমি আমার লেখা "সাঁওতালি ভাষার লিপি সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের সন্ধানে" বই-এ মন্তব্য করেছি সাঁওতালি ভাষার মত এত বৈচিত্র আর কোনো ভারতীয় ভাষায় নেই, পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় আছে কিনা আমি জানি না। কারণ আমি ভাষাতাত্ত্বিক নই। সাঁওতালি ভাষা শেখা খুব সহজ। কি ভাবে? সেটাই আমি এখানে উল্লেখ করব। যে কোনো ভাষায় দখল বা আয়ত্ত করায়ত্ত করতে গেলে 'Tense' বা 'কাল' জানা অপরিহার্য। এ ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য। তবে অন্য ভাষার সঙ্গে সাঁওতালির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অন্য ভাষার মত সাঁওতালি ভাষাকে আয়ত্ত করতে এত কসরত করতে হয় না। সাঁওতালি ভাষায় Tense বা কাল জানার আগে Number বা বচন অবশ্যই জানতে হবে। Number বা বচন জানতে পারলে যে কেউ সহজেই সাঁওতালি ভাষা শিখতে সক্ষম হবে। ইংরেজীতে Number এবং বাংলা বচন দুই প্রকারের। যেমন (১) Singular বাংলায় একবচন এবং (২) Plural বাংলায় বহুবচন কিন্তু, সাঁওতালি ভাষায় Number বা বচন সংস্কৃতের মত তিন প্রকারের। আমি আলোচনার শুরুতেই বলে নিয়েছি সংস্কৃত এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভারতীয় ভাষাগুলি সাঁওতালি থেকে শব্দ ধার করে সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃতের বহু আগে থেকেই সাঁওতালি ভাষা বিদ্যমান ছিল। একমাত্র ইংরেজী ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি আমার নেই, তাই অন্যদের কথা আমি বলতে পারছি না। ইংরেজী সংস্কৃতের স্বজাতির ভাষা অথচ ইংরেজীতে বচন

সংস্কৃতের মত তিন নয়, দুই। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না, আর্যদের সংস্কৃত সাঁওতালির প্রভাবে প্রভাবিত। সেই কারণেই সংস্কৃতেও বচন বা Number এর সংখ্যা তিন। সেই তিনটি বচন হল : একবচন, দ্বিবচন, এবং বহুবচন। সাঁওতালি ভাষার এই বচনকে কি করে সহজেই আয়ত্ত করা যায় এবং তা আয়ত্ত করলে কি করে সাঁওতালি 'Tense' বা কাল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মায় তাই এখানে উল্লেখ করছি :

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
আয়	আকিন	আক

Auxiliary বা সাহায্যকারী ক্রিয়ার ব্যবহার ইংরেজীতে আছে। সেই ক্রিয়াগুলি হল, am, is, are, have, has, was, were, had, shall এবং will প্রভৃতি। এই সহায়কগুলি Tense অনুসারে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালি ভাষাতেও অনুরূপ কয়েকটি Auxiliary Verb বা সাহায্যকারি ক্রিয়ার সাক্ষাত পাই। সেগুলি হল, এৎ, লেৎ, কেৎ, এন, কান, আকান, আকাৎ ইত্যাদি Presant এবং Past tense এর জন্য ভবিষ্যৎ বা Future tense এর জন্য আয়, আকিন এবং আক ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি সহায়ক ক্রিয়া আয়ত্ত করতে পারলেই যে কেউ সাঁওতালি tense বা কাল নির্ণয় করতে পারবে। এই সহায়কগুলির সঠিক এবং নিখুঁত ভাবে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
এদায়	এদাকিন	এদাক
লেদায়	লেদাকিন	লেদাক
কেদায়	কেদাকিন	কেদাক
লেদেয়ায়	লেদেয়াকিন	লেদেয়াক
কেদেয়ায়	কেদেয়াকিন	কেদেয়াক
মেয়ায়	মেয়াকিন	মেয়াক
এনায়	এনাকিন	এনাক
কানায়	কানাকিন	কানাক
আকানায়	আকানাকিন	আকানাক
আকাদায়	আকাদাকিন	আকাদাক
খন (হইতে)	খনকিন	খনক
দয় (অব্যয়)	দকিন	দক
বায় (না)	বাকিন	বাক
আলয় (না)	আলকিন	আলক

ইংরেজীতে Main verb এর সঙ্গে ing এবং বাংলায় ইতেছ, ইতেছি এবং ইতেছিল যোগ করে Tense বা কাল নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে সাঁওতালি ভাষায় Main verb এর পরে (আগে নয়) উপরোক্ত কয়েকটি Auxiliary verb বা সাহায্যকারী ক্রিয়ার সঙ্গে আয়, আকিন এবং আক যোগ করে সাঁওতালি ভাষায় যতগুলি tense বা কাল আছে তার সবগুলিকেই প্রকাশ করা যায়। তবে এখানে অন্যদের সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার মৌলিক পার্থক্য আছে। সাঁওতালি ভাষার একমাত্র উদাহরণ সাঁওতালিই। তার মত ভাষা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। অন্য ভাষার ক্ষেত্রে যেহেতু Subject বা কর্তার বচন হয়, ক্রিয়ার কোনো বচন হয় না— তাই Subject বা কর্তার উল্লেখ অপরিহার্য। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় তার প্রয়োজন হয় না। সাঁওতালি ভাষায় যেহেতু ক্রিয়ারও Number বা বচন হয় তাই বাক্য গঠন প্রণালীতে সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। আমি উদাহরণ স্বরূপ এখানে দু একটির কথা উল্লেখ করব তাহলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

Present tense বা বর্তমান কাল

(1) He is Comming (Singular)
সে আসিতেছে

(2) They are Comming (Plural)
তারা আসিতেছে

Past tense বা অতীতকাল।

(1) He was Comming (Singular)
সে আসিতেছিল

(2) They were Comming (Plural)
তারা আসিতেছিল

Future tense বা ভবিষ্যৎ কাল

(1) He will come (Singular)
সে আসিবে

(2) They will come (Plural)
তারা আসিবে

উপরে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন Tense বা কালের। প্রথমে ইংরেজীতে তৎপরে বাংলায়। বাক্যগুলি বাক্য গঠনের নিয়ম অনুসারে গঠিত। উপরোক্ত বাক্যগুলিতে কেবলমাত্র is comming. was comming এবং will come বললে বাক্যগঠন সম্পূর্ণ হয় না। নির্দিষ্ট ধারণাও জন্মায় না। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করে কেবলমাত্র ক্রিয়ার সাহায্যে

Subject বা কর্তার উল্লেখ ছাড়াই বাক্যগুলিকে প্রকাশ করা শুধু যায় না Subject সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট ধারণা জন্মে।

(1) হিজুঃক কানায় (Singular)

(2) হিজুঃক কানাকিন (Dual)

(3) হিজুঃক কানক (Plural)

(1) হিজুঃক কান তাঁহেনায় (Singular)

(2) হিজুঃক কান তাঁহেনাকিন (Dual)

(3) হিজুঃক কান তাঁহেনাক (Plural)

(1) হিজুঃক আয় (Singular)

(2) হিজুঃক আকিন (Dual)

(3) হিজুঃক আক (Plural)

প্রথম তিনটি বাক্যে (হেএচ/হেজ=আসা) মূল ক্রিয়ার সঙ্গে Auxiliary verb বা সহায়ক ক্রিয়া কান এর সঙ্গে আয়, আকিন এবং আক যোগ করে বচনে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

হেএচ/হেজ+কান+আয়=হিজুঃক কানায় (বর্তমান)

হেএচ/হেজ+কান+আকিন=হিজুঃক কানাকিন (ঐ)

হেএচ/হেজ+কান+আক=হিজুঃক কানাক (ঐ)

অনুরূপভাবে পরবর্তী দুটি বাক্যের একটিতে অর্থাৎ, অতীত কালের বাক্যে, বাক্যটিকে কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর করার জন্য তাঁহেকানায়, তাঁহে কানাকিন এবং তাঁহে কানাকর পরিবর্তে তাঁহের আগে কান বসিয়ে তাঁহের সঙ্গে আয়, 'আকিন এবং আক যোগ করা হয়েছে। তাই বাক্যটি শ্রুতি মধুর হয়েছে এবং সর্ব শেষের সঙ্গে কেবলমাত্র আয়, আকিন এবং আক মূল ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ করে ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যৎ কালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপরোক্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে যে কেউ চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে যে, প্রথম উদাহরণে একজনের, দ্বিতীয় উদাহরণে দুজনের এবং তৃতীয় উদাহরণে দুয়ের অধিকের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আরও কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হল।

Present

(1) He is working.

সে কাজ করিতেছে।

সাঁওতালি—কামি+এৎ+আয়=কামিয়েদায়

(2) They (two) are working.

তারা (দুজন) কাজ করিতেছে।

সাঁওতালি—কামি+এৎ+আকিন=`কামিয়েদাকিন
(3) They (more than two) are working.
তারা (দুয়ের অধিক) কাজ করিতেছে
সাঁওতালি—কামি+এৎ+আক=কামিয়েদাক

Past

(1) He ran away
সে পালিয়ে গেল
সাঁওতালি—দাইড়+কেৎ+আয়=দাইড়কেদায়
(2) They both ran away
তারা দুজনেই পালিয়ে গেল
সাঁওতালি, দাইড়+কেৎ+আকিন=দাইড়কেদাকিন
(3) They all ran away
তারা সবাই পালিয়ে গেল
সাঁওতালি—দাইড়+কেৎ+আক=দাইড়কেদাক
(1) He had Finished
সে শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল
সাঁওতালি—চাবা+লেৎ+আয়=চাবালেদায়
(2) They both had Finished
তারা দুজনেই শেষ করিয়াছিল
সাঁওতালি—চাবা+লেৎ+আকিন=চাবালেদাকিন
(3) They all had Finished
তারা সবাই শেষ করিয়াছিল
সাঁওতালি—চাবা+লেৎ+আক=চাবালেদাক

Future

(1) He will start soon
সে শীঘ্রই শুরু করবে
সাঁওতালি—লগনগে এহব+আয়=এহবায়
(2) They both will start soon
তারা দুজন শীঘ্রই শুরু করবে
সাঁওতালি—লগনগে এহব+আকিন=এহবাকিন
(3) They all will start soon.
তারা সবাই শীঘ্রই শুরু করবে
সাঁওতালি—লগনগে এহব+আক=এহবাক

এইভাবে উপরে নির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করে কর্তা এবং কর্ম ছাড়াই কেবলমাত্র ক্রিয়ার সাহায্যে সাঁওতালি ভাষায় সমস্ত Tense বা কাল নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির সংখ্যাও জানতে পারি। অনুরূপভাবে সেটা যদি First Person বা উত্তম পুরুষ হয় তখন আয়, আকিন এবং আক্'র বদলে আঞ, আলিঞ এবং আলে ব্যবহৃত হবে। যেমন—

(1) I am comming

আমি আসছি

সাঁওতালি—হিজুঃক কানাঞ (কান+অঞ)

(2) We (two) are comming

আমরা (দুজন) আসছি

সাঁওতালি—হিজুঃক কানালিঞ (কান+আলিঞ)

(3) We (all) are comming

আমরা (সবাই) আসছি

সাঁওতালি—হিজুঃক কানালে (কান+আলে)

এইভাবে, জম এদাঞ, জজম কাণাঞ (আমি খাচ্ছি) রুওয়াড় হিজুঃক কানাঞ (আমি ফিরে আসছি) ইত্যাদি।

Past

(1) I ran away

আমি পালিয়ে এলাম

সাঁওতালি—দাইড় কেদাঞ (কেদাৎ+আঞ)

(2) We (two) ran away

আমরা (দুজন) পালিয়ে এলাম

সাঁওতালি—দাইড় (ঞির) কেদালিঞ (কেৎ+আলিঞ)

(3) We (all) ran away

আমরা (সবাই) পালিয়ে এলাম

সাঁওতালি—দাইড় (ঞির) কেদালে (কেৎ+আলে)

এইভাবে হেএচ এনাঞ (আমি চলে এলাম) হেএচ আকানাঞ (আমি চলে এসেছি (Past) রাওয়াড় আকানাঞ (আমি ফিরে এসেছি (Past) রাপুদ আকাদাঞ (আমি ভেঙ্গে ফেলেছি (Past) ইত্যাদি।

Future

(1) I shall start

আমি শুরু করব

সাঁওতালি—এহবাঞ (এহব+আঞ)

(2) We (two) shall start
আমরা (দুজন) শুরু করব
সাঁওতালি—এহবালিঞ (এহব+আলিঞ)
(3) We (all) shall start
আমরা (সবাই) শুরু করব
সাঁওতালি—এহবালে (এহব+আলে)

এইভাবে জমাঞ (আমি খাবো) রহয়াঞ (আণি রোপন করব) ইত্যাদি। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যেগুলি সাঁওতালিতে বহু প্রচলিত এবং ব্যবহৃত। উদাহরণ স্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হল।

কিন্তু নির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বলতে হলে Affirmative এবং Negative অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক এবং না বাচক অংশে উল্লেখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে পুরুষের প্রথমাংশ থেকে যাবে এবং শেষাংশ Sentence বা বাক্যের অন্য অংশে যুক্ত হবে। যেমন—হুডুয় রহয় এদা অর্থাৎ সে ধান রুইছে। আয় এর আ এৎ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে এদা এবং 'য়' হুডু র সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে হুডুয়। অনুরূপ ভাবে, দাকায় জম এদা (সে ভাত খাচ্ছে), জামায় হরঃক এদা (সে জামা বা সার্ট পরছে) প্রথম পুরুষে দাকাঞ জম এদা। হুডুঞ রহয় এদা, জামাঞ হরঃক এদা ইত্যাদি।

সাঁওতালি ভাষায় অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত পুরুষগুলির একযোগে উচ্চারণ। যেমন রুওয়াড় কাতামাঞ অর্থাৎ, আমি তোমার দেওয়া ফিরিয়ে দেব, এখানে কাঃক এর আম এবং আঞ যুক্ত হয়ে হয়েছে কাতামাঞ। দাল মেয়াঞ—আমি তোমাকে পেটাব। হহ আমাঞ—আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব ইত্যাদি।

তবে প্রত্যেক ভাষায় কিছু কিছু মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ থাকে, যেগুলি তার নিজস্ব ব্যাকরণ অনুসারেই গড়ে ওঠে। তাই তার সঙ্গে অন্য কোন ভাষার হুবহু মিল খোঁজা অর্থহীন। সাঁওতালি ভাষাও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

অনুরূপ আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এখানে উল্লেখ করব। আমরা সবাই জানি Sentence বা বাক্যে Subject, Predicate, verb ইত্যাদি থাকে। এই নিয়মের হেরফের ঘটিয়ে আমরা Interrogative Sentence অর্থাৎ জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য তৈরি করি অর্থাৎ Sentence এর জায়গায় verb বসিয়ে এবং verb এর জায়গায় subject বসিয়ে Interrogative Sentence অর্থাৎ জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য তৈরী করি। যেমন :

Is he comming?

অর্থাৎ, সে কি আসছে? Tense বা কালের মত এখানেও এতসব নিয়ম ছাড়াই

সাঁওতালি ভাষায় কেবল একটিমাত্র শব্দে জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন বা Note of Interrogation বসিয়ে Interrogative Sentence বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য তৈরি করা যায়। তবে বাক্যটিকে নিখুঁত করার জন্য Number বা বচনের সঙ্গে সঙ্গে person বা পুরুষ জানা অবশ্যই দরকার। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি সাঁওতালি ভাষায় বচনের সংখ্যা তিন এবং অন্যদের মত person বা পুরুষের সংখ্যাও তিন। সেগুলি হল :

First Person উত্তম পুরুষ

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ইঞও	আলিঞও	আলে
আঞও	আলাং	আব

2nd Person মধ্যম পুরুষ

আম	আবিন/আবেন	আপে
এম	বেন	পে
মে		

3rd Person প্রথম পুরুষ

উনি	উনকিন	উনকু
নুই	নুকিন	নুকু
হানি	হানকিন	হানকু

আমরা জানি ইংরেজী এবং বাংলায় First Person বা উত্তম পুরুষের সংখ্যা দুই। যেমন, I, we বা আমি, আমরা। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় বচন যেহেতু দুটো নয় তিনটি তাই উত্তম পুরুষের সংখ্যাও তিন হওয়ারই কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সাঁওতালি ভাষায় উত্তম পুরুষের সংখ্যা ছয়। ইংরেজী এবং বাংলার মোট পুরুষের সমান। সাঁওতালি ভাষা যে, যথেষ্ট উন্নত এবং সমৃদ্ধ সেটা এই একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায়। সাঁওতালি ভাষায় ব্যক্তির নির্দেশকে নিখুঁত করার জন্য First Person বা উত্তম পুরুষের সংখ্যা ছয় করা হয়েছে। আমি বা আমরা যখন আমাদের উদ্দেশ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বলব তখন উপরের তিনটি অর্থাৎ ইঞও, আলিঞও এবং আলে ব্যবহৃত হবে কিন্তু আমরা নিজেরা যখন আমাদের মধ্যে আলোচনা করব তখন নীচের তিনটি আঞও, আলাং এবং আব ব্যবহৃত হবে। দু একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন :

চেৎ লেকা মেনাঃকবিনা/বেনা? অর্থাৎ তোমরা কেমন আছ? (মেনাঃক এর সঙ্গে আ বিনা যুক্ত হয়ে হয়েছে আঃবিনা (দ্বিবচন)। উত্তর হবে আলিঞও দলিঞও বেশ গেয়া। (গেয়ালিঞও এর লিঞও অব্যয় দ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আ

গেয়ার সঙ্গে পড়ে আছে) অর্থাৎ আমরা ভালই আছি। কিন্তু যদি এমন হয় আমরা বিপদে পড়েছি, কি করে উদ্ধার হব সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি তখন আলিঞ নয় ব্যবহৃত হবে আলাং। আলাং দ চেৎ লাং চিকায়া? এখন আমরা কি করব? (চিকায়ালাং এর লাং চেৎ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আ চিকার সঙ্গে পড়ে আছে)। অনুরূপ ভাবে দুয়ের অধিক হলে আবদ চেৎ বন চিকায়া? আমরা (বহুবচন) এখন কি করব? (চিকায়াবন এর বন চেৎ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আ চিকার সঙ্গে যুক্ত আছে, এসব নিয়ে পরে আলোচনা করব) এখানে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আর একটা ছোট্ট নিয়মের কথা উল্লেখ করব। সেটা হল 3rd Person বা প্রথম পুরুষের Singular Number বা একবচনে কোনো কিছুই যোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দ্বিবচনের ক্ষেত্রে শুধু 'কিন' এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে কু উচ্চারিত (উনকু) হয় তবে অন্য ক্ষেত্রে কেবল 'ক' যোগ করলেই হবে।

যেমন :

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
হড় (মানুষ)	হড়কিন	হড়ক
কুল (সিংহ)	কুলকিন	কুলক
হাঁড়ু (হনুমান)	হাঁড়ুকিন	হাঁড়ুক
গাড়ি (বানর)	গাড়িকিন	গাড়িক

এখন পুরুষ আয়ত্ত করলে Interrogative Sentence বা জিজ্ঞাসূচক বাক্য কি ভাবে তৈরি করা হয় সেটাই আলোচনা করব। যেমন :

(1) Are you weeping?

তুমি কি কাঁদছ?

সাঁওতালি

রাঃক এদাম?

রাঃক মনে কান্না, এৎ+আম, আম মানে তুমি (একবচন) এবং যেহেতু ইংরেজীতে ing এবং বাংলায় ইতেছ যোগ করা হয়েছে তাই পূর্বে আলোচিত এৎ যোগ করা হয়েছে এবং তার ফলে Interrogative Sentence বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যগঠনের নিয়ম ছাড়াই একটিমাত্র ক্রিয়াবাচক শব্দ দিয়ে Interrogative Sentence তৈরি করে বচনকেও নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে :

(2) Are you (two) weeping?

তোমরা কি কাঁদছ?

সাঁওতালি

রাঃ এদাবিনা/ বেন? (এৎ+আবিন/আবেন)

(3) Are you (all) weeping?

তোমরা (বহুবচন) কি কাঁদছ?

সাঁওতালি

রাঃক এদাপে? (এৎ+আপে)

অপরের বাড়িতে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হয়।

(1) May I come in?

আমি আসতে পারি?

হিজুঃক আঞ?

হেএচ, হেজ মানে আসা এবং First Person, Singular Number বা উত্তম পুরুষের একবচনে ইঞ বা আঞ ব্যবহৃত হয়।

(2) May we (two) come in?

আমরা (দুজন) কি আসতে পারি?

সাঁওতালি

হিজুঃক আলিঞ?

(3) May we (all) come in?

আমরা (বহুবচন) কি আসতে পারি?

সাঁওতালি

হিজুঃক আলে?

(1) Are you eating?

তুমি কি খাচ্ছ?

সাঁওতালি

জম এদাম? (এৎ+আম)

(2) Are you (two) eating?

তোমরা (দুই) কি খাচ্ছ?

সাঁওতালি

জম এদাবিন এদাবেন? (এৎ+আবিন/আবেন)

(3) Are you (all) eating?

তোমরা (বহুবচন) কি খাচ্ছ?

সাঁওতালি

জম এদাপে? (এৎ+আপে)

এইভাবে সাঁওতালি ভাষার Person বা পুরুষ জানতে পারলেই Interrogative Sentence বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা জন্মায়। Interrogative

Sentence বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য তৈরি করার সময় Person বা পুরুষ অনুসারে ক্রিয়া ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম কানুন নীচে উল্লেখ করা হল।

First Person বা উত্তম পুরুষ

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
এদায়িঞ	এদালিঞ	এদালে
এদাঞ		
লেদাঞ	লেদালিঞ	লেদালে
লেদেয়াঞ	লেদেয়ালিঞ	লেদেয়ালে
কেদাঞ	কেদালিঞ	কেদালে
কেদেয়াঞ	কেদেয়ালিঞ	কেদেয়ালে
মেয়াঞ	মেয়ালিঞ	মেয়ালে
এনাঞ	এনালিঞ	এনালে
কানাঞ	কানালিঞ	কানালে
আকানাঞ	আকানালিঞ	আকানালে
আকাদাঞ	আকাদালিঞ	আকাদালে
বাঞ (না)	বাংলিঞ	বাংলে
খনিঞ (হইতে)	খনলিঞ	খনলে
দঞ (অব্যয়)	দলিঞ	দলে

ঐ	লেদালাং	লেদাব
ঐ	লেদেয়ালাং	লেদেয়াব
ঐ	কেদালাং	কেদা
ঐ	কেদেয়ালাং	কেদেয়াব
ঐ	মেয়ালাং	মেয়াব
ঐ	এনালাং	এনাব
ঐ	কানালাং	কানাব
ঐ	আকানালাং	আকানাব
ঐ	আকাদালাং	আকাদাব
ঐ	বাংলাং	বাংব
ঐ	খনলাং	খনব
ঐ	দলাং	দব

Second Person বা মধ্যমপুরুষ

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
এদাম	এদাবিন/বেন	এদাপে
লেদাম	লেদাবিন/বেন	লেদাপে
লেদেয়াম	লেদেয়াবিন/বেন	লেদেয়াপে
কেদাম	কেদাবিন/বেন	কেদাপে
কেদেয়াম	কেদেয়াবিন/বেন	কেদেয়াপে
মেয়াম	মেয়াবিন/বেন	মেয়াপে
এনাম	এনাবিন/বেন	এনাপে
কানাম	কানাবিন/বেন	কানাপে
আকাদাম	আকাদাবিন/বেন	আকাদাপে
বাম (না)	বাবিন/বেন	বাংপে
আলম (না)	আলবিন/বেন	আলপে
খনেম (হইতে)	খনবিন/বেন	খনপে
দম (অব্যয়)	দবিন/বেন	দ[illegible]

এক কথায় জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য তৈরী করতে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করলেই হবে। কিন্তু যদি কখন, কোথায়, কোথা থেকে, কেন (When, Where, Which, Who) ইত্যাদি শব্দ দিয়ে Interrogative Sentence বা জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য তৈরী হয় তখন When, Where, Which এবং Who র সঙ্গে বচনে উল্লেখিত শব্দের শেষাংশ যুক্ত হবে এবং প্রথমাংশ ক্রিয়ার সঙ্গে থাকবে। যেমন কোথা থেকে আসছ? এখানে আসছ'র সঙ্গে আ এবং কোথার সঙ্গে ম যুক্ত হবে। ফলে বাক্যটি শ্রুতি মধুর হয়ে উঠবে। অকা খনেম হিজুঃ কানা? হিজুঃক কানাম (কানাম) আম এর ম খনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে খনেম এবং আ কান এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে কানা ফলে বাক্যটি শ্রুতি মধুর হয়ে উঠেছে। এইরূপ ভাবে তুমি কবে এসেছে? তিসেম হেএচ আকানা? তুমি কোথায় যাবে? আকাতেম চালাঃক আ? তুমি কখন আসবে? তিনরেম হিজুঃক্আ? তুমি ভাত খেয়েছ? দাকাম জম আকাদা? অনুরূপ ভাবে দ্বিবচন এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে 'ম'র বদলে বিন/বেন এবং পে ব্যবহৃত হবে ব্যক্তি বাচকের ক্ষেত্রে, কিন্তু বস্তুবাচক বা জড় পদার্থের বেলায় কেবলমাত্র আ ব্যবহৃত হবে। 'আ' এর পরবর্তী অংশ ব্যবহৃত হবে না। তখনই বোঝা যাবে কথোপকথন প্রাণীবাচক না বস্তুবাচকের উদ্দেশ্যে। যেমন, হুড়ু গেলে আকানা? ধানে কি শিস ধরেছে? জঁড়রা অমন আকানা? ভুট্টার দানা থেকে চারা গজিয়েছে? তিনাঃক সাডে কানা?' কটা বেজেছে? দারে রাপুদ আকানা? গাছ

কি ভেঙ্গে গেছে? দাঃক হিজুঃকোনা, দাঃক ঞেলঃক কানা? ঝড় বৃষ্টি কি আসবে বলে মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? ইত্যাদি।

সাঁওতালির মত বাংলাতেও অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ বিধি লক্ষ করা যায় (এটাকে সাঁওতালির ব্যর্থ অনুকরণ বলা যায়)। কিন্তু সাঁওতালির মত তা নিখুঁত এবং নির্দিষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ৩/৪ জন ছাত্র ইস্কুলে পৌঁছে দেখলেন যে, শিক্ষক মহাশয় ইতিমধ্যেই শ্রেণী কক্ষে পৌঁছে গেছেন। তাদের কেউ একজন (সবাই এক সঙ্গে বলে না) যথারীতি মাস্টার মশাই কে জিজ্ঞেস করলেন স্যার, আসতে পারি? মাস্টার মশাই হ্যাঁ বলে অনুমতি দিলেন। কিন্তু এখানে যেটা লক্ষণীয়, মাস্টার মশাই হ্যাঁ বলে অনুমতি দিলেও বিভ্রান্তি থেকে যায়। কারণ শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করার জন্য তিনি একজনকেই নাকি সবাইকেই অনুমতি দিয়েছেন সেটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় হিজুঃক আঞ, হিজুঃক আলিঞ এবং হিজুঃক আলে বললে আর কোন বিভ্রান্তি থাকে না। কারণ এই জিজ্ঞাসা সূচক বাক্যের মধ্যেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সংখ্যাও বলা আছে। আবার অনেক সময় কর্তার উল্লেখ ছাড়াই, কোথায় যাব? কবে যাব ইত্যাদি কথা বাংলায় ব্যবহার হয় বটে তবে এখানেও সাঁওতালির সঙ্গে বাংলার মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ সাঁওতালি ভাষায় 'অকাতেম' 'তিসেম' ইত্যাদি প্রশ্নবাচক শব্দের মধ্যেই ব্যক্তির সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। অন্য ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার মৌলিক পার্থক্য এখানেই। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সাঁওতালির এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য সম্পর্কে কেউই তেমন সচেতন নন আর তাই বাংলায় যেমন বাংলা এবং ইংরেজীর সংমিশ্রণে তৈরি অর্থাৎ বাংরেজীর রেওয়াজ বহুল পরিমাণে প্রচলিত, সাঁওতালদের মধ্যেও অনুরূপভাবে বাংলার সঙ্গে সাঁওতালির অর্থাৎ বাঁওতালির রেওয়াজ ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে।

সাঁওতালি ভাষার আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আমি ভাষার মানদণ্ডে সাঁওতালি সভ্যতা কতটা উন্নত ছিল তার আলোচনা করব। সেই দুটির একটি হল Affirmative এবং Negative এবং অপরটি The.

Sentence দু প্রকারের। প্রথমত Affirmative এবং দ্বিতীয়ত Negative অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক এবং না-বাচক। সাঁওতালি ভাষায় Negative বা না-বাচক বাক্য গঠনের সময় না-বাচকের 'না'র বচন পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ Interrogative Sentence এর মত এখানেও পুরুষের শেষাংশ 'না' র সঙ্গে যুক্ত হবে এবং প্রথমাংশ মূল ক্রিয়ার সঙ্গে থেকে যাবে। যেমন :

সে আসবে না—উনিদ বায় হিজুঃক আ (আয় এর আ হিজুঃক এর সঙ্গে

রয়ে গেছে এবং 'য়' বাংএর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বায় হয়েছে)।

যেয়োনা—আলঅ চালাঃকমা (আম এর আ চালাঃক এর সঙ্গে রয়ে গেছে এবং 'ম' আলর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে আলম)।

সে যেন না আসে—আলয় হিজুঃক মা (আয় এর আ 'মা'র সঙ্গে রয়ে গেছে এবং 'য়' আলর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলয় হয়েছে)।

কিন্তু Affirmative বা হ্যাঁ-বাচক বাক্যে কর্তার উল্লেখ করতে হয় না। (যেখানে উল্লেখ করতে হয় সেখানে Introgative Sentence এর কখন, কোথায়, কোথা থেকে ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য হয় এখানেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য হবে)। এখানে কর্তার পরবর্তী অংশের সঙ্গে পুরুষের শেষাংশ প্রযুক্ত হবে এবং প্রথমাংশ যথারীতি মূল ক্রিয়ার সঙ্গে থেকে যাবে। যেমন :

আমি আগেই বলেছি—মড়াংরেগেঞ লাই আকাদা।

আমি কালকেই এসেছি—হলারেগেঞ হেএচ আকানা।

আমি এখনই চলে যাব—নিতগিঞ চালাঃক আ।

মাড়াং, হলা এবং নিত এর সঙ্গে আঞ (ইঞ) এর 'ঞ' যুক্ত হয়েছে এবং আ যথারীতি আকাৎ, আকান এবং চালাঃক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাই আলাদা ভাবে প্রথমেই 'ইঞ' উল্লেখের (আমি) প্রয়োজন হয় নাই।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইংরেজীতে যেমন 'The' ব্যবহৃত হয় অনুরূপ ভাবে সাঁওতালি ভাষায় নির্দিষ্ট ভাবে বলার জন্য 'ইচ' ব্যবহৃত হয়। যেমন, শিশির জাওইচ (সৃষ্টিকর্তা) সাপড়াওইচ (সম্পাদক) এবং জজমইচ (যমরাজ) ইত্যাদি। তবে ইংরেজীর মত সাঁওতালি 'ইচ' শব্দটি নির্বিচারে এবং পাইকারি হারে ব্যবহৃত হয় না। কারণ সাঁওতাল বিশ্বাস করে সবাই (The) তার উপযুক্ত নয়। যোগ্যও নয়। কিন্তু সাঁওতালদের নূতন প্রজন্ম এই সব Traditional এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত নিয়ম কানুনকে Backdated মনে করে বর্জন করতে শুরু করেছে এবং স্থান, কাল, পাত্র ছাড়াই নির্বিচারে তাদের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই অধঃপতন সমাজ জীবনের কোন স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে সেটা বোঝা যায় যখন দেখি 'আম' এর পরিবর্তে বাংলার আপনি এবং হিন্দি আপ এর অনুকরণে নির্বিচারে 'আবিন' ব্যবহার করতে। সাঁওতালি ভাষায় 'আম' এর পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'আবিন' ব্যবহারের রীতি আছে বটে তবে সর্বত্র 'আবিন' ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম 'আবিন' কে নির্বিচারে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে নিজেদের হাস্যস্পদ করে তুলেছেন, অন্যকেও বিড়ম্বনায় ফেলছেন।

সাঁওতালি ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে আমি (উল্লেখ)

বলেছি **Sentence** বা বাক্যের দুটো অংশ, **Affirmative** অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক এবং **Negative** অর্থাৎ না-বাচক। **Sentence** বা বাক্য তৈরি করার সময় বচনের প্রথমাংশ **auxialiary verb** অর্থাৎ সাহায্যকারী ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং শেষাংশ **Negative** বা নাবাচকের ক্ষেত্রে 'না'র সঙ্গে কিন্তু **Affirmative** এর ক্ষেত্রে যা কর্তার পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঙ্গে যুক্ত হবে। নিম্নে প্রদত্ত ক্রিয়ার বেলায় অর্থাৎ যেখানে আম, আবিন এবং আপে'র পরিবর্তে কেবল এম/মে, বিন/বেন এবং পে যুক্ত হচ্ছে সেখানে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এখানে বাক্যের কোথাও আর কিছু যোগ বিয়োগের প্রয়োজন নাই।

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
(এম/মে)	(বিন)	(পে)
	'অ'	
অলমে	অলবিন/বেন	অলপে
অজগমে	অজগবিন/ঐ	অজগপে
অতায়েম	অতায়েবিন/ঐ	অতায়েপে
অরেমে	অরেবিন/ঐ	অরেপে
	'আ'	
আগুইমে	আগুইবিন/বেন	আগুইপে
আকরিঞমে	আকরিঞবিন/ঐ	আকরিঞপে
আকরিঞএম	আকরিঞএবিন/ঐ	আকরিঞএপে
আঁতেনমে	আঁতেনবিন/ঐ	আঁতেনপে
	'ই'	
ইরমে	ইরবিন/বেন	ইরপে
ইদিমে	ইদিবিন	ইদিপে
	'এ'	
এরমে	এরবিন/বেন	এরপে
	'উ'	
উদুগমে	উদুগবিন/বেন	উদুগপে
উকুইমে	উকুইবিন/বেন	উকুইপে
উদমে	উদবিন/বেন	উদপে
	'ক'	
কুলিয়েম	কুলিয়েবেন/বিন	কুলিয়েপে
কুলেমে	কুলেনি/বেন	কুলেপে

কয়েমে	কয়েবিন/বেন	কয়েপে
কয়মে	কয়বিন/বেন	কয়পে
কয়কম(বহু)	কয়কবিন/বেন	কয়কপে
কিরিএঙমে	কিরিএঙবিন/বেন	কিরিএঙপে
কিরিএঙআয়মে	কিরিএঙআয়বিন/বেন	কিরিএঙআয়পে
কয়গমে	কয়গবিন/বেন	কয়গপে
	'খ'	
খজমে	খজবিন/বেন	খজপে
খজেমে	খজেবিন/বেন	খজেপে
	'গ'	
গডমে	গডবিন/বেন	গডপে
গজেমে	গজেবিন/বেন	গজেপে
গলমে	গলবিন/বেন	গলপে
গিড়িমে	গিডিবিন/বেন	গিডিপে
গটায়মে	গটায়বিন/বেন	গটায়পে
গিতিচমে	গিতিচবিন/বেন	গিতিচপে
গদমে	গদবিন/বেন	গদপে
গদঃকমে	গদঃকবিন/বেন	গদঃকপে
গংমে	গংবিন/বেন	গংপে
গংএমে	গংএবিন/বেন	গংএপে
গগমে	গগবিন	গগপে
গুগুইমে	গুগুইবিন/বেন	গুগুইপে
গাতেয়েম	গাতেয়েবিন/বেন	গাতেয়েপে
গাতেঃকমে	গাতেঃকবিন/বেন	গাতেঃকপে
	'চ'	
চাপাদেম	চাপাদেবিন/বেন	চাপাদেপে
চাপাদমে	চাপাদবিন/বেন	চাপাদপে
	'জ'	
জগমে	জগবিন/বেন	জগপে
জমমে	জমবিন/ঐ	জমপে
জমেমে	জমেবিন/ঐ	জমেপে
জাপিৎমে	জাপিৎবিন/বেন	জাপিৎপে

'এঙ'

এঙইমে	এঙইবিন/বেন	এঙইপে
ঞিঙরমে	ঞিঙরবিন/ঐ	ঞিঙরপে

'ত'

তেএঙমে	তেএঙবিন/বেন	তেএঙপে
তিএঙমে	তিএঙবিন/ঐ	তিএঙপে
তুলমে	তুলবিন/ঐ	তুলপে
তুলেমে	তুলেবিন/ঐ	তুলেপে
তলমে	তলবিন/ঐ	তলপে
তুদমে	তুদবিন/ঐ	তুদপে
তলেমে	তলেবিন/ঐ	তলেপে
তাঁগিএঙমে	তাঁগিএঙবিন/ঐ	তাঁগিএঙপে
তিঁগূঁনমে	তিঁগূঁনবিন/ঐ	তিঁগূঁনপে
তাঁহেনমে	তাঁহেনবিন/ঐ	তাঁপেনপে

'থ'

থাইয়ায়েম	থাইয়ায়েবেন/বেন	থাইয়ায়েপে
থায়য়মে	থায়য়বিন/বেন	থায়য়পে
থাপায়েম	থাপায়েবিন/বেন	থাপায়েপে

'দ'

দালমে	দালবিন/বেন	দালপে
দহয়মে	দহয়বিন/বেন	দহয়পে
দালেমে	দলেবিন/বেন	দালেপে
দিপিলমে	দিপিলবিন/বেন	দিপিলপে
দুডুপমে	দুডুপবিন/বেন	দুডুপপে

'ন'

নতেমে	নতেবিন/বেন	নতেপে
নঙ্কায়মে	নঙ্কায়বিন/বেন	নঙ্কায়পে

'প'

পেরেজমে	পেরেজবিন/বেন	পেরেজপে
পুইমে	পুইবিন/ঐ	পুইপে
পাঁজায়েম	পাঁজায়েবিন/ঐ	পাঁজায়েপে
পাডহাওমে	পাড়হাওবিন/ঐ	পাড়হাওপে

পাঁজায়মে	পাঁজায়বিন/ঐ	পাঁজায়পে
	‘ফ’	
ফুডুগমে	ফুডুগবিন/বেন	ফুডুগপে
	‘ব’	
বাগিয়েম	বাগিয়েবিন/বেন	বাগিয়েপে
বায়মে	বায়বিন/বেন	বায়পে
বাগিমে	বাগিবিন	বাগিপে
বেরেৎমে	বেরেদবিন/বেন	বেরেদপে
	‘ম’	
মেনমে	মেনবিন/বেন	মেনপে
মাগমে	মাগবিন/বেন	মাগপে
মাগেমে	মাগেবিন/বেন	মাগেপে
মেতায়মে	মেতায়বিন/বেন	মেতায়পে
	‘র’	
রড়মে	রড়বিন/বেন	রড়পে
রাগমে	রাগবিন/ঐ	রাগপে
রহয়মে	রহয়বিন/ঐ	রহয়পে
রেদমে	রেদবিন/ঐ	রেদপে
রয়েমে	রয়েবিন/ঐ	রয়েপে
রেজেমে	রেজেবিন/ঐ	রেজেপে
রেয়াড়ঃকমে	রেয়াড়ঃকবিন/ঐ	রেয়াড়ঃকপে
রাড়ায়মে	রাড়ায়বিন/ঐ	রায়াড়পে
রুইমে	রুইবিন/ঐ	রুইপে
	‘ল’	
লাইমে	লাইবিন/বেন	লাইপে
লায়মে	লায়বিন/ঐ	লায়পে
লুইমে	লুইবিন/বেন	লুইপে
ললয়মে	ললয়বিন/বেন	ললয়পে
লাগমে	লাগবিন/বেন	লাগপে
	‘স’	
সিদমে	সিদবিন/বেন	সিদপে
সেনঃকমে	সেনঃকবিন/বেন	সেনঃকপে

(চালাঃক)	(ঐ)	(ঐ)
সেরেঞমে	সেরেঞবিন/বেন	সেরেঞপে
সাবেমে	সাবেবিন/বেন	সাবেপে
সাগাড়মে	সাগাড়বিন/ঐ	সাগাড়পে
	'হ'	
হহয়মে	হহয়বিন/বেন	হহয়পে
হাতাওমে	হাতাওবিন/বেন	হাতাওপে
হাইরমে	হাইরবিন/বেন	হাইরপে
হালাংমে	হালাংবিন/বেন	হালাংপে
হদমে	হদবিন/বেন	হদপে
হবরমে	হবরবিন/বেন	হবরপে
হবরএম	হবরএবিন/ঐ	হবরেপে
হেওয়েমে	হেওয়েবিন/ঐ	হেওয়েপে
হেওয়েএম	হেওয়েএবিন	হেওয়েএপে

এখনো পর্যন্ত অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, সাঁওতালি ভাষার অন্তর্ভুক্ত মোট শব্দকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। বাক্যরচনার নিরিখে এই দুভাগের একভাগকে বলতে পারি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ Flexible এবং অন্যভাগকে রক্ষণশীল অর্থাৎ Rigid। নীচে পরিবর্তনশীল ও রক্ষণশীলের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

পরিবর্তনশীল (Flexible)

(১) রু (বাজানো) বাক্যরচনার সময় তার সঙ্গে 'ই' যোগ করে উচ্চারিত হবে রুইমে অর্থাৎ তোমাকে বাজাতে বলছি।

(২) পু (কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করা) পুই মে

(৩) ঞু (পান করা) ঞুইমে

(৪) গুগূ (পিঠে করে নেওয়া) গুগূই মে

(৫) উকু (লুকানো) উকুই মে

(৬) আগূ (নিয়ে আসা) আগূই মে

(৭) সিৎ (শাক, ফুল তোলা) সিদ মে

(৮) গদ (কাঁচা আনাজ, ফল তোলা) গদ মে

(৯) তুৎ (উপড়ানো) তুদমে

(১০) চাপাৎ (ঢিল মারা) চাপাদ মে

(১১) রেৎ (পুঁটলি) রেদ মে
(১২) হেএচ (আসা/পাতা ছেঁড়া) হিজুঃকমে/হেজমে
(১৩) রেএচ (কেড়ে নেওয়া) রেজে মে
(১৪) র (ঝলসানো অর্থে) রয়ে মে
(১৫) লা (গর্ত খোঁড়া) লায় মে
(১৬) উদুঃক (দেখানো) উদুগ মে
(১৭) উৎ (গিলে ফেলা) উদ মে
(১৮) অজঃক (গায়ে মাখা) অজগ মে
(১৯) কয়ঃক (তাকিয়ে দেখা) কয়গ মে
(২০) ফুডুঃক (শাল পাতার তৈরী বাটি) ফুডুগমে ইত্যাদি।

রক্ষণশীল (Rigid)

রক্ষণশীলে ক্ষেত্রে বচন পরিবর্তনের সময় কোন কিছুই যোগ করতে হয় না।
(১) রহয় (রোপন করা) রহয় মে
(২) দিপিল (মাথায় নেওয়া) দিপিল মে
(৩) কিরিঞ (কেনা) কিরিঞ মে
(৪) আকরিঞ (বেচা) আকরিঞ মে
(৫) গড (ভূমিষ্ঠ প্রনাম) গড মে
(৬) গিতিচ (শোওয়া) গিতিচ মে
(৭) হালাং (কুড়িয়ে আনা) হালাং মে
(৮) হাইর (ঝাঁটা দিয়ে জড়ো করা) হাইর মে
(৯) গং (সাড়া দেওয়া অর্থে) গং মে
(১০) গিডি (ফেলে দেওয়া) গিডি মে
(১১) দাল (লাঠি পেটা) দালে মে
(১২) দুডুপ (বসা) দুডুপ মে
(১৩) সাগাড় (গাড়ি) সাগাড় মে
(১৪) হাতাও (নিয়ে নেওয়া অর্থে) হাতাও মে ইত্যাদি।

ব্যাকরণ রচনা আমার উদ্দেশ্য নয় (সেটা অন্যত্র করব)। সে কথা আমি আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। সাঁওতালি ভাষার বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথাই এখানে উল্লেখ করা হল। আমি হলপ করে বলতে পারি এবং **guarantee** দিতে পারি, আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্য সমূহকে আয়ত্ত করলেই যে কেউ সাঁওতালি ভাষাকে অনুধাবন করতে পারবে। তবে যাতে কেউ

বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য সাঁওতালি শব্দ জানার প্রয়োজন আছে। কারণ সাঁওতালি ভাষায় দু একটা এমন শব্দ আছে যাদের উচ্চারণ ভুল করে আম, ইঞ মনে হতে পারে। যেমন, তাপাম (লড়াই) সুনুম (তেল) উনুম (চোবানো) ঞুতুম (নাম) হুতুম (হাত মুখ ধোওয়া), সাগিঞ (দূরে) তিঞ (পাথর ছোঁড়া) তুঞ (তীরমারা) ইত্যাদি।

আমরা এখন যে যুগে বাস করছি তাকে গতির যুগ বলা হয়। এখন হাঁটলে চলবে না দৌড়াতে হবে। কারণ মানুষের হাতে এখন একদম সময় নেই। তথাকথিত সভ্যদের এটা বুঝতে একবিংশ শতাব্দী লেগে গেল আর সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা সেটা কয়েক হাজার বছর আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে তাদের মুন্সিয়ানা বা কুশলতা বা দক্ষতা সে কথাই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে। সাঁওতাল নিজে তার শ্রম দিয়ে তার প্রতিবেশীকে উন্নত করেছে, সমৃদ্ধশালী করেছে অপরদিকে আবার তাঁর মুখের ভাষাও তার প্রতিবেশীর মুখের ভাষাকে নিজের উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। এটা কথার কথা নয়, ঘটনা।

"সাঁওতালি ভাষার মাণদণ্ডে সভ্যতার বিচার"

আমরা বর্তমানে যে যুগে বাস করছি তাকে বলা হয় কমপিউটারের যুগ বা Age of Computer. ইতিমধ্যে মানুষ চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, মঙ্গলগ্রহের রহস্য উন্মোচনের জন্য ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে দুদিন আগেও যেটা কল্পনা ছিল এখন সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে কেবল তাই নয় তার সংজ্ঞাও পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু একদিনে তো মানুষ এখানে পৌঁছোয়নি। বহু বছরের সাধনায় একটু একটু করে একেকটা ধাপ ডিঙিয়ে সে আজকের অবস্থায় এসেছে। সাঁওতালরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী (Aboriginal) ভূমিপুত্র কিনা সে নিয়ে মতভেদ আছে। তারা তথাকথিত সভ্যদের কথায় Semi Savage অর্থাৎ অর্দ্ধ বর্বর। এটাই প্রচলিত ধারণা। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা বহিরাগত আর্যদের তৈরি করা। কথাটা কতদূর সত্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তার বিচার করব। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপাদানের বড় অভাব। এ কথা ঐতিহাসিকরা তাঁদের রচনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক টড বলেছেন, "Much disappointment has been felt in Europe at the Sterility of the historical muse of Hindustan". হিন্দুস্থানের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয়দের অনেক বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়েছে। ভারতে আগত বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক আল বিরুণী বলেন, "হিন্দুরা ঐতিহাসিক রচনার প্রতি উদাসীন,

এখানকার কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য চাপ দিলে এরা কল্পনা ও কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করে"। ঐতিহাসিক ফ্লিট বলেছেন, হিন্দুরা ইতিহাস লিখতে জানত না এবং তাদের ঐতিহাসিক বোধও ছিল না। তারা ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক আখ্যান রচনা করতে পারত মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়"। কিথ বলেন যে, প্রাচীন ভারতীয়দের সাহিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্যের যুগে ভারতের গ্রন্থকারদের মধ্যে কোনও একজনকেও যথার্থ ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করা যায় না" (তথ্য সূত্র অতুল কৃষ্ণ রায় এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত—ভারতের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড)। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বা এহেন বিভ্রান্তির কারণ বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণকে অবলম্বন করে বা ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা, যা কিনা আর্যদের রচনা বলে দাবী করা হয়। অথচ মজার কথা হল বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণে উল্লেখিত নদনদী, স্থান এবং প্রাচীনকালে অবস্থিত রাজন্যবর্গের নাম ইত্যাদি প্রায় সবই ভারতবর্ষের, রচয়িতার নিজের অতীত জীবন নিয়ে এই সব নিদর্শন কিছুই বলে না। ভারতের বাইরের কোনো কিছুরই আলোকপাত বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ করে না। বাইরের যা কিছুর আলোচনা বা উল্লেখ প্রায় সবই অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই কারণে পুরাণ রচনার কাল নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে এদের রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে, কারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে এগুলি রচিত। আবার ম্যাক্সমুলারের মতে এগুলো ১২০০-১০০০ অব্দের মধ্যে রচিত (তথ্য সূত্র, ঐ)। বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ আর্যদের রচনা হলেও হতে পারে। তবে এগুলি যে আর্যদের ভারতে আগমনের অনেক পরে রচিত হয়েছে একথা হলপ করে বলা যায়। কারণ আর্যদের ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই এগুলো রচিত হলে রচনার কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও থাকতে পারত। কিন্তু তাদের অতীত সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে মতভেদ থাকার কথা নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে এ নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে আর্যরা ভারতীয় বংশোদ্ভুত, ভারতবর্ষ থেকেই এরা পশ্চিম এশিয়ায় গিয়েছিলেন। এঁদের দলে আছেন এ, সি, দাস, পুসলকর এবং লক্ষ্মীধর শাস্ত্রীর মত ঐতিহাসিকরা। আবার অন্য দলের মতে আর্যরা বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের দলে আছেন ম্যাক্সমুলার, ম্যাকডোনাল্ড, গিল এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মত নামকরা ঐতিহাসিকরা। আমি আগেই বলেছি বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ যার রচয়িতা আর্যরা বলে দাবী করা হয় সেই সব গ্রন্থে আর্যদের অতীত

জীবন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলে না। অন্যের রচনাকে নিজের বলে দাবী করা আর্যদের কাছে নতুন কিছু নয়। এরা চিরকাল অন্যের ন্যায্য অধিকারকে গায়ের জোরে অস্বীকার করে নিজের বলে দাবী করে এসেছে এবং এখনও করছে। একসময় ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতেন বৈদিক সভ্যতাই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানীর তৎপরতায় মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় সভ্যতার নির্দশন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সেই দাবী খারিজ হয়ে যায়। আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই যে, এখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই সভ্যতার রচয়িতা কারা? কারা এই সভ্যতা গদে তুলেছিলেন? নিঃসন্দেহে সাঁওতালরা। সাঁওতালদের ঐতিহ্য কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির নিরিখে বলা যায় সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরাই এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিকরা সোজাসুজি এই কথা স্বীকার না করলেও অস্বীকার করেন না অর্থাৎ পরোক্ষভাবে একথা তারা স্বীকার করে নিয়েছেন।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণে উল্লেখিত ঘটনা, পর্বত গাত্রে এবং পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপি যদি প্রাচীন কালের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণীয় হয় তবে একটা জাতির জীবনশৈলী যেটা তার নিজস্ব, যেটা সম্পূর্ণভাবে অন্যের প্রভাব মুক্ত সেটা কেন ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে গণ্য হবে না? প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি অতীত ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত এবং এখন সর্বজন গ্রাহ্য। সাঁওতালরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনার অসংখ্য উপাদান অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তাহলে প্রাচীন ইতিহাস রচনায় এগুলো গ্রহণীয় হবে না কেন?

ভাষার মূল সম্পদ তার শব্দভাণ্ডার, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই শব্দের একাধিক উৎস থাকে তাও বলা হয়েছে। যে কোনো ভাষায় কিছু কিছু শব্দ থাকে যেগুলি তার নিজস্ব আর কিছু থাকে ধার করা বা আগন্তুক—যেগুলি প্রয়োজনের তাগিদে আহৃত। সাঁওতালি ভাষায় বিদেশী শব্দ আছে। কিন্তু তার নিজস্ব বা মৌলিক শব্দ এত বেশি পরিমাণে আছে যে, যেগুলো দিয়ে অবলীলায় প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, একদা সাঁওতালি সভ্যতা বেশ উন্নত ছিল। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সভ্যতার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার অনুরূপ নিদর্শন সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম গুলিতে এখনো অবশিষ্ট আছে। বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা তখন গড়ে ওঠেনি। সাঁওতালদের পূর্ব

পুরুষরাই এই গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার গোড়া পত্তন করেছিলেন। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম এবং যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল জাহের। জাহেরকে বাদ দিয়ে সাঁওতালরা গ্রামের কথা চিন্তাই করতে পারে না। জাহেরের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক আবহমান কালের। গ্রামের উপকণ্ঠে জাহের এরার গোড়া পত্তন গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

গোষ্ঠীজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, মানুষ যখন কৃষিকাজ করতে শিখল তখন সে যাযাবরের মত জীবনযাপন পরিত্যাগ করে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অপরিহার্য বাড়ি-ঘর তৈরি করল। বাড়ি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ সে প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করল। সেই উপকরণ দিয়ে সে তৈরি করল বাড়ি-ঘর এবং তার নাম দিল 'অড়াঃক'। এই অড়াঃক শব্দটাকে ভাঙ্গলে বা সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাই দুটো শব্দ অড়+আঃক। অড় বলতে বোঝায় উৎস আর আঃক বলতে বোঝায় ধনুক। আদি বাড়ি-ঘরের রহস্য এখানেই লুকিয়ে রয়েছে। ইদানীং সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে দুই প্রকারেব বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের একটাকে বলে বাংলা অড়াঃক এবং অন্যটাকে বলে চাতম আড়াঃক। নামকরণ থেকেই মোটামুটি বুঝতে পারা যায় বাংলার প্রচলন ইদানীং কালের, যার সঙ্গে সাঁওতালদের পরিচয় ছিল না। তারা চাতম অর্থাৎ ছাতার মত দেখতে বা ধনুকাকৃতির সঙ্গেই পরিচিত ছিল। তার সমর্থনে আমি এখানে যে সব নিদর্শন পেশ করব সেটা যে অভ্রান্ত তা সাঁওতালদের যে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। দেওয়ালের ব্যবহার হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে বাড়ি-ঘর তৈরি হত খুঁটি পুঁতে। ধনুকাকৃতি বাড়ি-তৈরি করতেই কেবল এই দুটো খুঁটির প্রয়োজন, বাংলা বাড়ির জন্য নয়। দেওয়ালের প্রচলন হবার পর মাটিতে খুঁটি পোঁতার রেওয়াজ উঠে গেছে। এখন মাটির দেওয়ালে দুটো গর্ত করে সেখানে সাঁঘা বসিয়ে ধনুকাকৃতি বাড়ির জন্য প্রধান অবলম্বন তৈরি করা হয়। কিন্তু অতীতে তা হত না। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ছাতার মত দেখতে ধনুকাকৃতি বাড়িই প্রথমে তৈরি হয়েছিল। বাড়ি তৈরির যে সব উপকরণ লাগে সাঁওতালি ভাষায় তার আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন কাঠামো তৈরির জন্য লাগে সেনের, বাতা এবং ঘর ছাইবার জন্য খড় যাকে সাঁওতালি ভাষায় বুশুপ বলে। এইভাবে তৈরি হল বাড়ি ঘর এবং গড়ে উঠল গ্রাম। গ্রামের দুপাশে বাড়ি ঘরের মাঝখানে যাওয়া আসার রাস্তা সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে কুলহি। এই কুলহির সঙ্গে আবার নদনদীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। নদীর দুপাশে পাড় মাঝখানে জল প্রবাহিত হবার

রাস্তা। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই মনে হয় সাঁওতালদের পূর্ব পুরুষরা গ্রামের নামকরণ করেছিলেন আতু কারন। নদীর দু পাশের পাড়ের মাঝখান দিয়ে জলের স্রোত প্রবাহিত হওয়াকেও সাঁওতালি ভাষায় বলা হয় আতু। এতো গেল আতু আড়াঃক অর্থাৎ বাড়িঘর এবং গ্রামের কথা। কিন্তু ঘর গেরস্থালি করতে গেলে প্রয়োজনীয় উপকরণ লাগে। যেমন খাওয়া দাওয়া, রান্নাবান্না এবং হাত ধোওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। কাঁসা পেতলের ব্যবহার সাঁওতালদের কাছে অজানা ছিল বলেই মনে হয়, তবে বনের লতাপাতা দিয়ে তৈরি পাতড়া এবং ফুড়ুঃক এর ব্যবহার সাঁওতালদের মধ্যে ছিল। পাতড়াকে দেখতে থালার মত এবং ফুড়ুঃক দেখতে বাটির মত গোলাকার এবং কোনো কোনোটা চৌকোনা। এগুলি সরু সরু কাঠি দিয়ে পাতার সঙ্গে পাতা জোড়া দিয়ে তৈরি হয়। এগুলো ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ইদানীং শাল পাতার পুনঃপ্রচলন হয়েছে। কাঁসা পেতলের ব্যবহার না থাকলেও মাটির তৈরি হাঁড়ি কলসির ব্যবহার সাঁওতালদের মধ্যে ছিল। নীচে মাটির তৈরি দু একটা মৃৎপাত্রের নামের তালিকা দেওয়া হল :

(১) টুকুচ—মাটির তৈরি হাঁড়ি কলসি উভয়কেই বোঝায়।

(২) দাকা টুকুচ—ভাতের হাঁড়ি।

(৩) হাঁড়ি টুকুচ—হাঁড়িয়া ধরার জন্য বরাদ্দ মাটির তৈরি হাঁড়ি।

(৪) চেলাং—তরকারি রান্নার জন্য অবিকল কড়াই এর মত দেখতে মৃৎপাত্র।

(৫) কারাহি—ঐ

(৬) হাঁডা—জল ধরার জন্য বড় হাঁড়ি।

(৭) কাঁড়া—জল বইবার জন্য মাটির হাঁড়ি।

(৮) ঠিলি—কলসী ইত্যাদি।

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গেলে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন হয় ক্ষেত খামারের। নীচে ফসল ফলাবার জন্য তৈরি দু একটি খামারের নাম দেওয়া হল :

(১) বাড়গে—কাঁচা আনাজ, শাকসবজি এবং মরশুমি ফসল ফলাবার জন্য নির্ধারিত থাকে। এর আয়তন খুব বড় হয়। এর আবার রকমফের আছে। সীমানা দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

(২) অড়াঃক বাড়গে—বাস্তু জমি। এর এক কোণে থাকে বাসা বাড়ি এবং রাচা বা উঠোন/আর সেই কারণেই এর নাম অডাঃক বাড়গে। এখানে উৎপাদিত হয় কাঁচা আনাজ এবং শাকসবজি।

বাড়গেয় উৎপাদিত কয়েকটি ফসলের নাম :

(১) জঁডরা—ভুট্টা।

(২) রাহেড়—অড়হর ডাল।

(৩) হড়েচ—এদের চাষ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেই সীমাবদ্ধ। স্থানীয় নাম কুড়থি ডাল।

(৪) রাঁবড়া—বিউলির ডাল।

(৫) তুড়ি—সর্ষে।

(৬) গুঁজা—এদের চাষও সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেই সীমাবদ্ধ। তেলের জন্যই এদের চাষ হয়।

(৭) আড়াঃক বা শাখ সবজি : শাক সবজির মধ্যে গাঁধারি কাম্বা, চাকণ্ডি ইত্যাদি।

(৮) মারিচ—লঙ্কা।

(৯) সুনুম—তেল।

(i) তুড়ি সুনুম—সর্ষে তেল।

(ii) গুঁজা সুনুম—গুঁজা তেল।

(iii) নিম সুনুম—নিম তেল।

(iv) কুঁইডি সনুম—মহুয়ার ফল থেকে তৈরি সুনুম।

(v) কুরুচ সুনম—করঞ্জা তেল।

(vi) জাডা সুনুম—জাড়া তেল, মালিশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(vii) বারু সুনুম—কুসুম ফল থেকে তৈরি করা তেল।

এ গুলোর মধ্যে তুড়ি এবং গুঁজাই খাওয়া এবং মাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকিগুলো অন্য কাজে লাগে। এদের মধ্যে আবার বর্তমানে কেবল সরষের চাষ হয়, অন্য তেল এখন আর তৈরি হয় না। তেল তৈরির নিজস্ব পদ্ধতি আগে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার প্রচলন নাই। দু ফালি চ্যাপটা মোটা কাঠের মাঝখানে বীজ ফেলে তেল বার করা হত। তেল নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পুরোনো বিদায় নিয়েছে। জাডা বা জাড়া ইদানীং আর দেখা যায় না। অতীতে এক সময় গ্রামে গঞ্জে প্রচুর পরিমাণে জাডা দারে বা জাড়া গাছ দেখা যেত। এর ফল নিংড়ে তেল বার করা হত। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে জাড়া তেল দিয়ে মালিশ করলে ক্লান্তি মুহূর্তেই উধাও হয়ে যেত।

ভুট্টার প্রচলন সাঁওতালদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। কোথাও কোথাও এখনও আছে। ছোটনাগপুর মালভূমি ভুট্টা চাষের পক্ষে উপযোগী। ভুট্টাকে যেমন

পুড়িয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে অন্যদিকে আবার ভুট্টা প্রধান খাদ্য হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভুট্টা চাষের জমিকে প্রথমে লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। জমিতে দু তিনবার লাঙ্গল দেওয়ার পর জমি উপযুক্ত হয়ে গেলে পাত্রে (টুপলাঃক) করে ভুট্টার বীজ এনে লাঙ্গল দেওয়া মাটির পেছন পেছন হেঁটে একটা করে ভুট্টার দানা ফেলে দিতে হয়, সেই বীজ লাঙ্গল দিয়ে চাপা দেওয়া হয়ে গেলে পুনরায় দানা ফেলতে হয়। এই ভাবে দানা ফেলার একটাই কারণ যাতে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব বজায় থাকে এবং যাতে সেই বীজ বেড়ে উঠবার জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে পারে। ভুট্টার বীজ বোনা হয়ে গেলে মাটিতে মই দিয়ে বীজ চাপা দিয়ে সমান করে দেওয়া হয়। ভুট্টার বীজ ফেলার আগে বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখতে হয় ফলে কয়েকদিনের ব্যবধানেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা বেরিয়ে আসে। চারা একটু বড় হলে কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটিকে আলগা করে দিতে হয়। সাঁওতালি ভাষায় তাকে বলে 'পু' স্থানীয় কথ্য ভাষায় কড় দেওয়া। ভুট্টা গাছ যাতে লম্বা এবং ফলন ভাল হয় তাই দু বার কড় বা 'পু'র নিয়ম আছে। যাদের জমি কম তারা নিজেরাই কড় দেয় কিন্তু যাদের জমি বেশি তারা গ্রামের দু পাঁচ জনকে কড় দেওয়ার জন্য ডাকে। আগে তাদের কেবল খাবার এবং যাই হউক একটা কিছু দিলেই হত কিন্তু এখন খাওয়া ছাড়াও নগদে কিছু দিতে হয়। এইভাবে অল্পদিনের ব্যবধানেই ভুট্টার গাছ বড় হয় এবং ফলন ধরে। গাছে সাধারণত একটাই ফল ধরে তবে কোনও কোনও গাছে দুটোও ফল ধরতে দেখা যায়। ফলগুলি যখন ডাঁসা হয় তখন গাছ থেকে তুলে আগুনে পুড়িয়ে খেলে প্রচণ্ড সুস্বাদু লাগে। সাঁওতালি ভাষায় তাকে বলে গাদার জঁড়রা। ভুট্টা তিন মাসের ফসল। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে ভুট্টার ফল ঝুনোয় রূপান্তরিত হয় তখন ফল গুলিকে তুলে একটার সঙ্গে আর একটাকে বেঁধে মালার (গালাং) মত তৈরি করে ঘরের কড়ি কাঠে কিছুদিনের জন্য ঝুলিয়ে রাখতে হয়। পরে তাদের মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে আঘাত করে করে বীজ আলাদা করা হয়। তার থেকে ভুট্টা বীজ আলাদা করে অবশিষ্ট ভুট্টা রাহা খরচের জন্য বরাদ্দ করা হয়। শুকনো ফলকেও পুড়িয়ে খাওয়া হয় বটে তবে শুকনো ফল গাদার বা ডাঁসার মত সুস্বাদু হয় না। এ ছাড়াও আর যেভাবে খাওয়া হয় সেগুলি হল আতা জঁড়রা বা ভুট্টা ভাজা এবং দাঃক মাডি বা মাড় ভাত। মাড় ভাতের জন্য ঢেঁকিতে ছেঁটে দানাকে দু ফালি করা হয় আবার ঘেঁট বা পায়েসের জন্য দানাকে সম্পুর্ণ গুঁড়ো করা হয়। সাঁওতালি ভাষায় তাকে লেট বলে। এ ছাড়াও ভাজা ভুট্টাকে ঢেঁকিতে ছেঁটে সম্পূর্ণ রূপে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে পরিমাণ মত গুড় মিশিয়ে ডুঁবুঃক বা মিঠাই বানিয়ে খাওয়া হয়। ভুট্টার গুঁড়িকে সাঁওতালি ভাষায় লুবুঃক বলে।

ভাত পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হত বকাঃক অর্থাৎ হাতা। এটা তৈরি হত সাধের লাউ দিয়ে। তার জন্য লাউকে না তুলে লতায় রেখে শুকানো হত এবং প্রয়োজনের সময় দুভাগ করে পরিবেশনের জন্য হাতার আকার দেওয়া হত। ১৫/২০ বছর আগেও এদের বেশ ব্যবহার ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই বললেই চলে। পরবর্তীকালে ধাতুর ব্যবহার শুরু হলেও এদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নি। এসব হাতা তৈরির জন্য আলাদা একটা সম্প্রদায় ছিল যাদের বলা হত মালোওয়ার। আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগেও এই মালোওয়ারদের আমি গ্রামে এসে ধাতুর জিনিষ তৈরি করতে দেখেছি। কিন্তু বর্তমানে তাদের আর দেখা যায় না।

বাড়গে বা বাস্তু জমিতে ধান উৎপাদিত হয় না, ধান উৎপাদনের জন্য আলাদা জমির দরকার হয়। তার গঠনও আলাদা। বর্তমানে অবশ্য ফাঁকা মাঠে বোরো ধানের চাষ হলেও আমন চাষের জন্য জমির চারপাশে উঁচু উঁচু আল বা আড়ে দিয়ে জল ধরার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ আমনের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে জলের প্রয়োজন হয় আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে দু ধরনের জমি দেখতে পাওয়া যায় তার একটাকে বলে বাইদ অর্থাৎ ডাঙ্গা জমি এবং অন্যটাকে বলে বাইহাড় অর্থাৎ জলাজমি। সাঁওতালদের অধিকৃত জমির মধ্যে বাইহাড়ের পরিমাণ অত্যল্প কারণ অতীতে অতি বর্ষণের ফলে জলা জমিতে ফসল ভালো হত না। ধানে পোকা লাগত। রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই জলা জমির তুলনায় ডাঙ্গা জমিকেই তারা বেশি পছন্দ করত। ইদানীং বর্ষার অভাবে ডাঙ্গা জমিতে আর আগের মত ফসল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কৃষিজীবি হয়েও তারা চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি।

চারা বা ইতা হুড়ু ফেলার জন্যে জমিতে আলাদা জায়গা নির্ধারিত থাকে। চারার জন্য সম্বৎসরের খরচ থেকেই বীজ ধান বা ইতাহুড়ু আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়। উপযুক্ত সময় হলে নির্ধারিত জায়গার মাটিকে লাঙ্গল দিয়ে মাটিকে চারা গজাবার উপযুক্ত করা হত। সার হিসেবে বাড়িতেই উৎপাদিত গোবর ব্যবহৃত হয়। লাঙ্গল দিয়ে মাটি তৈরি হয়ে গেলেই তার উপরে গোবর ছড়িয়ে ইতা হুড়ু বা বীজ ধান বুনে মই দিয়ে বীজ ধান চাপা দেওয়া হয় যাতে পশুপক্ষী বীজ ধান খেয়ে নষ্ট না করতে পারে। তারপর বৃষ্টির জল পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ধানের বীজ থেকে চারা গাছ জন্মায়, চারা একটু বড় হলেই লাঙ্গল দিয়ে মাটিকে ধান রোপণের উপযুক্ত করতে হয়। বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলে আঁটি বেঁধে রোপণের আগে পর্যন্ত বীজতলায় ফেলে রাখা হয়। ধানের চারা লাগাবার জমি

একদিনে তৈরি হয় না। পর পর দু তিন দিন মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। প্রথম দিন জমিকে ‘জাভড়’ দিয়ে রেখে পরদিন পুনরায় লাঙ্গল দিতে হয়। জমি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে মাটিতে ধানের চারা পুঁতে দিতে হয়। বৃষ্টির জল পেয়ে চারা গাছ লম্বা হতে থাকে। ক্রমে ধানের চারায় শিস দেখা দেয়। এই শিসকে সাঁওতালি ভাষায় বলে ‘গেলে’। বাইদ বা ডাঙ্গা জমির ধান তিন মাসের মধ্যে পেকে যায়, কিন্তু বাইহাড় বা জলা জমির ধান পাকতে একটু বেশি সময় লাগে। ডাঙ্গা জমির ধান সাঁওতালদের বড় উৎসব সহরায় এর আগেই ধান ঝাড়ার জন্য নির্মিত খারাই বা খোলায় তুলে ধান ঝেড়ে প্রথমে ধানকে হাঁড়িতে জল ঢেলে সেদ্ধ করা হয়। তারপর পুনরায় তাকে রোদে শুকাতে হয়। পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে ঢেঁকিতে ছাঁটা হয়, তাকেই ঢেঁকি ছাঁটা চাল বলে। সেই ঢেঁকি ছাঁটা নতুন চাল দিয়ে ভাত রান্না হয় বটে তবে সেই নতুন চালের ভাত সাঁওতাল নিজে খায় না, সেই ভাতের সঙ্গে রানু মিশিয়ে হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া তৈরি করে এবং তাদের প্রধান উৎসব সহরায়ের আয়োজন করে। নতুন চালের ভাত দিয়ে তৈরি করা হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে পাঁচ দিনের উৎসব সহরায়ের মধ্যে দিয়ে কৃষি কাজে নিযুক্ত হালের (বলদ) গরু এবং মহিষের কৃষি কাজে অপরিসীম অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে।...তবে এখানে বলে রাখা ভাল সাঁওতালদের কাছে সহরায় মাত্র পাঁচদিনের উৎসব নয়, তার পেছনে থাকে তাদের বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতি। কার্তিক মাসের আমাবস্যা তিথিতে পাঁচদিনের উৎসব সহরায় শুরু হলেও বর্ষা ঋতুর অবসানে আশ্বিনের শুরু থেকেই সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের আকাশে বাতাসে সহরায়ের সুর এবং বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়। সহরায়, সারি সহরায় এবং জম সহরায় নামে পরিচিত হলেও যেহেতু তারা কৃষিজীবি, কৃষিই তাদের প্রধান উপজীবিকা, তাই কৃষি কাজে গরু এবং মহিষের অপরিসীম অবদানের কথা স্মরণ করে তার বন্দনা করা হয়। পাঁচদিন ধরে তার বাসস্থান অর্থাৎ গোয়াল ঘর সরষের তেল দিয়ে আলোয় আলোকিত করে তোলা হয়। তার ঢুকবার রাস্তায় গোবর দেওয়া হয়। চালের গুঁড়ি জলে গুলে গোবর দেওয়া রাস্তায় নকসা বা আলপনা আঁকা হয়। গোয়াল ঘরে গোয়াল পূজা করা হয়। কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জল দিয়ে ধুয়ে এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়। সর্বশেষ ধানের শিস দিয়ে তৈরি ধাঁওয়া ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাই দিয়ে তাকেও সজ্জিত করা হয়। কপালের দুপাশে সিং দুটোয় দুটো ধাঁওয়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যারা তাদের সম্বৎসরের খোরাক যোগায় তাদের কথা স্মরণ করেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রপাতির নাম। কৃষিকাজের জন্য প্রথমেই লাগে লাঙ্গল এবং হালের গরু।

(১) নাহেল : লাঙ্গল। লাঙ্গল তৈরি করতে সাঁওতালরা ওস্তাদ। এক টুকরো বড় গুঁড়ি কেটে কেটে লাঙ্গলের আকার দেওয়া হয়। তাতে দু, দুটো ফুটো থাকে অন্য দুটো কাঠ লাগাবার জন্য। এই দুটোর একটাকে বলে কাঁড়বা যেটা লাঙ্গল চালাবার সময় বাঁ হাতে চেপে ধরতে হয় এবং ডান হাত দিয়ে লাঙ্গলে জোতা গরুকে লাঠি দিয়ে সঠিক ভাবে পরিচালনা করা হয়। অন্যটাকে বলা হয় ইসি। ইসি হিসেবে ব্যবহৃত কাঠকে অবশ্যই একটু লম্বা এবং সোজা হতে হয়। এর একাপ্রান্তে তিনটে খাঁজ কাটা থাকে এবং ইসির অপর প্রান্ত রুকা (বাটালি) দিয়ে চেঁচে ছোট একটা গর্ত করা হয়। চাঁচা অংশ লাঙ্গলের গর্তে পুরে দিয়ে ইসির গর্ত একটুকরো ছোট কাঠ দিয়ে আটকে দিতে হয় যাতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় সেটা খুলে না যায়। ইসির অপর প্রান্তে যেখানে তিনটে খাঁজ কাটা থাকে সেখানে (সাঁওতালি ভাষায় জোয়ালকে আঁড়ার বলে) জোয়াল লাগিয়ে গরুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। ইতিমধ্যে Tractor, Power Tiller আবিষ্কৃত হলেও লাঙ্গলের ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায়নি, এখনো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়নি।

সংরক্ষণের সুবাদে ইদানীং দু একজন চাকরি বাকরি করলেও কৃষির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবহমান কালের। এরা মূলতঃ কৃষিজীবি। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং ঘর গেরস্থালির প্রয়োজনীয় উপকরণ এরা আবহমান কাল থেকেই তৈরি করে আসছে। হিন্দুদের মত এদের মধ্যে বর্ণভেদ ছিল না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা নিজেরাই করে। বনের বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে কৃষিকাজের উপযোগী করে তুলেছে এবং সেগুলিকে রাখার জন্য ঘরের মধ্যে পৃথক গড়া অড়াঃক বা গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা করেছে। পি. সি. রায় চৌধুরির নিম্নলিখিত মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—

'The Santals have a numbar of other hunting implements, fishing nets etc., all of which go to show that they studied the nature and habits of wild animals, birds and so forth, and have fashioned their implements accordingly.' (Bihar district Gazetteers Santal Pargana—P. c. Roy Choudhury, পৃষ্ঠা-৮৬৮)

অর্থাৎ, শিকারের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, মাছ ধরার জন্য জাল, বনের পশু পাখি এবং অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ করলে মনে

হয় সাঁওতালরা প্রকৃতিকে নিঁখুতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই তৈরি করেছে। নীচে কয়েকটি গৃহ পালিত পশুর নাম দেওয়া হল :

(১) ডাংরা—বলদ গরু, যাদের দিয়ে কৃষি কাজ হয়।

(২) দামকম—পুরুষ গরু কিন্তু কৃষি কাজের উপযুক্ত হয়নি। জোয়াল তখনও কাঁধে পড়েনি।

(৩) গাই ডংরি—গাই গরু যে এক বা একাধিক বাচ্চা দিয়েছে।

(৪) পেঁঠাড় : স্ত্রী গরু কিন্তু বাচ্চা দেয়নি।

(৫) মিহু—বাছুর।

(৬) উরিচ—গাই গরু এবং বলদ গরু উভয়কেই বোঝায়।

(৭) কাডা—পুরুষ মোষ। কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। পুরুষ মোষের লাঙ্গলকে কাডা নাহেল এবং গরুর লাঙ্গলকে ডাংরি নাহেল বলে।

(৮) বিতকিল—স্ত্রী মোষ।

(৯) তওয়া—দুধ।

(১০) দাহে—দই।

(১১) গুরিচ—গোবর। কৃষিকাজে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জমিতে এক বছর গোবর সার হিসেবে ব্যবহৃত হলে তার কার্যকারিতা তিন বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। গোয়ালঘর থেকে গোবর তুলে ফেলার জন্য বাড়ির কাছাকাছি গর্ত করা হয়, যাকে গুরিচ গাডা বলে। এ ছাড়াও গো চারণের ভূমি থেকে গোবর সংগ্রহ করে গোবর ফেলার গর্তে ফেলা হয়। ইদানীং কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হবার ফলে কৃষকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এ সব ব্যবহারের ফলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পেলেও জমির উরর্বতা নষ্ট হয়ে গেছে, ভাতের স্বাদও পাল্টে গেছে। এতদিন পর্যন্ত যারা কৃষকের বন্ধু বলে পরিচিত হয়ে এসেছে, যারা এতদিন ধরে কৃষকের উপকার করে এসেছে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তাদের বংশধররাও প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে।

(১২) মেরম—ছাগল।

(১৩) মেরম হপন—ছাগল ছানা।

(১৪) ভেডা—ভেড়ি।

(১৫) ভেডি—স্ত্রী ভেড়ি।

(১৬) শুকরি—শুয়োর।

(১৭) কুডু—শুয়োর ছানা।

(১৮) ঢঙ্গা—শুয়োরের খাবার জায়গা।

(১৯) সিম—মোরগ এবং মুরগী উভয়েই।

(২০) সাঁড়ি—মোরগ।

(২১) এঙ্গা—মুরগী।

(২২) মুরগীর বাচ্চা—সিমহপন।

(২৩) গেড়ে—হাঁস।

(২৪) গেড়ে এঙ্গা—হংসী।

(২৫) গেড়ে আঁড়িয়া—হংস।

(২৬) গেড়ে হপন—বাচ্চা হাঁস।

(২৭) গুডু—ইঁদুর।

(২৮) চুটিয়া—নেংটি ইঁদুর।

(২৯) রেকটে—মেঠো ইঁদুর।

(৩০) পুষি—বেড়াল।

(৩১) পুষিহপন—বেড়াল ছানা।

(৩২) সেতা হপন—কুকুর ছানা।

কুকুরের প্রভুভক্তি সাঁওতালদের কাছে অজানা ছিল না। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য তাদের কাছেও কুকুর পোষার রেওয়াজ আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। বাংলায় বসার (Sit) প্রকার ভেদ না থাকলেও সাঁওতালি ভাষায় আছে। মানুষের বেলায় 'দুডুপ' ব্যবহৃত হলেও চতুষ্পদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'বুরুম' আবার পাখীর বেলায় বলতে হয় 'আফ' আকানায়। এইভাবে বসার রকমফের শব্দ ব্যবহার করে প্রাণীবাচক প্রজাতির মধ্যে সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। ধানের চাষ যে সাঁওতালিদের মধ্যে অজানা ছিল না উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। ধানকে সাঁওতালি ভাষায় বলে হুড়ু। বীজ ধানকে বলে ইতা হুড়ু। এই বীজ ধান সম্বৎসরের খাবার থেকে আলাদা করে পটম বা বাঁদি করে রাখা হয়। প্রথমে ধান কেটে এক জায়গায় এক সঙ্গে একটু একটু করে জড়ো করা হয়। ধান কাটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জড়ো করা ধানের আঁটি বাঁধা হয়। এই আঁটি নির্ভর করে ধানের ফলনের উপর। যে সব ধানের ফলন ভাল খড় একটু লম্বা হয় তাদের আঁটি ছোট হয় কিন্তু যাদের ফলন ভালো নয় এবং খড় লম্বায় কম তাদের আঁটি বড় হয়। সাঁওতালি ভাষায় এদের আলাদা নাম আছে। প্রথমোক্তকে বলে 'লট' কিন্তু দ্বিতোয়োক্তকে বলে 'বিঁড়া'। আঁটি বাঁধা হয়ে গেলে সাগাড় গাড়ীতে অথবা মাথায় করে ধান ঝাড়ার জন্য নির্মিত খোলা, সাঁওতালি ভাষায় যাকে 'খারাই' বলে, এনে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়। সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে 'লট চাকে'।

তারপরে ধান ঝেড়ে একত্রিত করা হয়। তারপর সেখান থেকে রাহা খরচের জন্য কিছু ধান সরিয়ে রেখে বাকিটা সংরক্ষণ করা হয়, এবং সংরক্ষণের জন্য উপকরণ খড় থেকেই তৈরি করা হয় এবং প্রয়োজন মত তা থেকে একটু একটু করে বার করে ঢেঁকিতে ছেঁটে ধান থেকে চাল করা হয়। বাংলার তুসকে সাঁওতালি ভাষায় বলে হেড়ে এবং চালকে বলে চাওলে। এখানে লক্ষণীয় যে তুষকে সাঁওতালি ভাষায় হেড়ে বললেও তুষের আগুনকে কিন্তু হেড়ে সেঙ্গেল বলে না বলে বুরসী সেঙ্গেল। তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় বলে সাহিত্যের (Phrase হিসেবে) পাশাপাশি শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একসময় সাঁওতালদের মধ্যে বুরসি সেঙ্গেলের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোথাও কোথাও তুষের আগুন বা বুরসি সেঙ্গেলের প্রচলন এখনো আছে। বুরসি সেঙ্গেল ছাড়াও তুষ বা হেড়ে সাঁওতালরা মাটির দেওয়াল লেপার কাজে ব্যবহার করে। এছাড়াও ধানের আর একটা By Product সেটা সাঁওতালরা নিজেরা নয় তাদের গৃহপালিত পশু শুকরি বা শুয়োরকে খাওয়ায় তার নাম 'লুবুঃক'। নীচে চাল এবং চাল থেকে তৈরি কয়েকটি খাদ্য দ্রব্যের নাম দেওয়া হল :

(১) চাওলে—চাল।

(২) দাকা—বলতে কেবল চালের ভাতকেই বোঝায়।

(৩) দাঃকমাড়ি—চালের মাড়ভাত। সাঁওতালদের মধ্যে এর বেশ প্রচলন আছে।

(৪) খাজাড়ি—ভুট্টা ভাজাকে জঁড়রা আতা বললেও চাল ভাজাকে চাওলে আতা বলে না, বলে খাজাড়ি। বাংলায় যাকে বলে মুড়ি সাঁওতালি ভাষায় তাকেই বলে খাজাড়ি।

(৫) হলং—চালের গুঁড়ি। এই গুঁড়ি থেকেই বিভিন্ন রকমের পিঠে তৈরি হয়।

(৬) হাঁড়ি-চাল থেকে ভাত তৈরি হয়। সেই ভাত দাউড়ায় (বেতের তৈরি এক রকমের বড় পাত্র বিশেষ) ছড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা করে তার মধ্যে রানু (রোন থেকেই এসেছে, রানু, রান মানে ঔষধ), স্থানীয় কথ্য ভাষায় যাকে বাকর বলে, ছড়িয়ে মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখতে হয়। তিন, চার দিন পরে ভাত হাঁড়ি বা হাঁড়িয়ায় রূপান্তরিত হয়। এই হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া সাঁওতাল মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে প্রথমে উৎসর্গ করে পালা পার্বণে নিজেও পান করে। হাঁড়িয়া ছাড়া মারাং বুরু সন্তুষ্ট হয় না। সাঁওতালরা যে কৃষিজীবী, আদিকাল থেকে তারা যে কৃষিকাজ করে আসছে এটাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া দু রকমের হয়। একটাকে বলে তাং হাঁড়ি এবং অপরটাকে বলে বডচ হাঁড়ি। হাঁড়িয়া স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি তো করেই না বরং উপকারে লাগে।

সাঁওতালি ভাষা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নীচে তাদের কয়েকটির কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হল। সাঁওতালি ভাষায় জলকে বলে দাঃক আর আনাকে বলে আগু। বাংলায় বলে 'জল আনতে গেছে' সাঁওতালি ভাষায় কিন্তু তা বলে না বলে 'দাঃক লুয়' চালাও আকানা অর্থাৎ জল আনতে গেছে। কুয়ো থেকে জল আনাকে বলে 'দাঃকলু' কিন্তু বাড়ি আনা জলকে আনতে বললে বলে 'দাঃক আগুয় মে'। আবার জল খাওয়াকে বলে 'দাঃক ঞু কিন্তু মাড়ভাত খাওয়াকে 'ঞু' বলে না বলে 'জোঁবেদ মে'।

(১) তিঞ—পাথর ছোঁড়া।

(২) চাপাদ—ঢিল অথবা লাঠি ছোঁড়া।

(৩) লেবদা—ঐ

(৪) তুঞ—তীর ছোঁড়া যেমন বেঝা তুঞ বলতে লক্ষ্য বস্তুর উপর তীর নিক্ষেপ বোঝায়।

(৫) টুটি—ধনুকে ছুঁড়বার এক রকমের অস্ত্র অথবা বন্ধুককে গুলি ছোঁড়াকে বোঝায়।

(৬) জম—খাওয়া যেমন ভাত খাওয়া। তরকারি খাওয়া ইত্যাদি।

(৭) সিৎ, সিদ—শাক তোলা, ফুল তোলা ইত্যাদি।

(৮) হেএচ—পাতা তোলা।

(৯) গৎ—বেগুন, টম্যাটো তোলা।

(১০) তিয়োঃক—উপর থেকে কিছু তোলা বা পাড়া।

(১১) হালাং—মাটিতে পড়ে থাকা যা কিছু তুলতে হালাং ব্যবহৃত হয়।

(১২) হৎ—তাড়াতাড়ি একসঙ্গে অনেকগুলি তোলাকে বলে হদমে। আবার অনেক সময় তাড়াতাড়ি হাঁটতে বললেও বলে, তাড়াম হদমে।

(১৩) উঞ—দড়ি পাকানো, খড় দিয়ে তৈরি বড় শিকল ইত্যাদি পাকানোকে উঞ বলে।

(১৪) গালাং—মালা গাথাকে গালাং বলে।

(১৫) গুতু—ফলে দড়ি পরানো, অথবা সরু কিছু দিয়ে গায়ে আঘাত করাকে গুতু বলে।

(১৬) লাড়গা—পাকা ফল অথবা মাছকে একের পরে এক মালার মত গাঁথাকে লাড়গা বলে।

(১৭) পাটি—সরু কাঠি দিয়ে একটার পর একটা পাতা জোড়া দেওয়া অথবা গয়না পরার জন্য নাক অথবা কান ফুটো করা বোঝায়।

(১৮) রঃক—কাঁথা সেলাই অথবা ছুঁচ দিয়ে কোনো কিছু সেলাই করা বোঝায়।

(১৯) তুড়—গায়ে হুল ফোটানোকে বলে তুড় কিদিএগ্রায়।

(২০) হুডুং—ঢেঁকিতে ধান ভানাকে বলে হুডুং।

(২১) লাহুৎ—ঢেঁকিতে সম্পূর্ণ গুঁড়ো করাকে বলে লাহুৎ।

(২২) সবঃক—লাঠি সোঁটা দিয়ে খোঁচা মারা বোঝায়।

(২৩) তুপুৎ—মোরগের লড়াই। মোরগ অথবা মুরগী যখন মানুষকে ঠোঁট দিয়ে কামড়ায় তখন বলে 'তুৎ' কিদিএগ্রায়।

(২৪) রপঃক—গরুর সঙ্গে গরুর অথবা মোষের সঙ্গে মোষের লড়াই বোঝায়। এবং সিং দিয়ে মারার জন্য যখন মানুষের দিকে তেড়ে আসে তখন বলে 'ররঃক কানায়।'

(২৫) তাহুড়—শুয়োরের সঙ্গে শুয়োরের লড়াই। অনুরূপভাবে দাঁত বার করে মানুষের দিকে তেড়ে এলে বলে 'তাহুড় ইঞও লাগিৎ এ।'

(২৬) চাটিচ—দেওয়াল থেকে মাটি সিমেন্ট ইত্যাদি খসে পড়াকে বলে 'চাটিচ।'

(২৭) ধাসুড়—জলের তোড়ে খামারের আল অথবা বাঁধের আল ধসে পড়লে বলে ধাসুড়। পোড়াবাড়ির দেওয়ালের কিয়দংশ ধসে পড়াকেও বলে ধাসুড়।

(২৮) ফুড়—নিজেরাই যখন জল বেরিয়ে যাবার রাস্তা করা হয় তাকে 'ফুড়' বলে।

(২৯) গাডলাঃক—গর্ত।

(৩০) ভুগাঃক—ইঁদুরের গর্ত অথবা ইঁদুরের অনুরূপ যে কোন গর্ত।

(৩১) হেতেল—ইঁদুর যখন গর্ত বানায়। গর্ত থেকে মাটি তুলে বার করে তাকে বলে 'হেতেল আকাদায়।'

(৩২) তুকা—পাখি অথবা ইঁদুর যখন বাসা বানাবার জন্য খড় কুটো জড়ো করে তাকে বলে 'তুকা।'

(৩৩) তেএও—দড়ি দিয়ে খাট বোনা অথবা জাল বোনাকে বলে 'তেএও।'

(৩৪) গাঃক—মাকড়ার জাল বোনাকে বলে 'গাঃক আকাদায়।'

(৩৫) দাপ—বাড়ির ছাউনি তৈরি করাকে বলে 'দাপ আকাদায়।'

(৩৬) গেৎ—কুটি কুটি করে কাটা।

(৩৭) মাঃক—কুড়াল দিয়ে কাটা।

(৩৮) রাপুৎ—নিজে থেকেই ভেঙ্গে যাওয়াকে রাপুদ বলে।

(৩৯) তপাঃক—দড়ি ছিঁড়ে যাওয়াকে বলে তপাঃক।

(৪০) অড়েচ—গাছের পাতা অথবা বইএর পাতা ছিঁড়ে যাওয়াকে বলে অড়েঃচ।

(৪১) চির—কাপড় ছেঁড়াকে বলে চির।

(৪২) রচৎ—চটকে যাওয়া কিন্তু টুকরো লেগে থাকাকে বলে রচৎ।

(৪৩) আতিএঃ—গরু মোষ মাঠে চরানো অথবা বলি দেবার উদ্দেশ্যে যখন মুরগীকে চরানো হয়।

(৪৪) উডাও—পাখি উড়ে যাওয়াকে বলে 'উডাও এনায়।'

(৪৫) অটাং—কোনো কিছু হাওয়ায় উড়ে যাওয়াকে বলে আটাং।

(৪৬) উডার—রাখাল বালকেরা গো চারণের জন্য গরুর পাল মাঠে নিয়ে যায়। কিন্তু খাবার সময় তারা গরুর পাল মাঠের এক জায়গায় জড়ো করে পালা করে বাড়িতে খেতে আসে। খাওয়া হয়ে গেলে পুনরায় গো চারণের জন্য গরুর পাল উঠিয়ে নিয়ে যায় তাকে বলে উডার।

(৪৭) ডিগলাউ—ধুলো উড়িয়ে আনাকে বলে ডিগলাউ।

(৪৮) গাউয়িচ—হাত দিয়ে ইশারা করা।

(৪৯) গাদুচ—গায়ে হাত দিয়ে ডাকা এবং গর্ত থেকে মাটি তোলা।

(৫০) গেএচ—হাতের নিম্নাংশ দিয়ে চাঁচা।

(৫১) ঢাপৎ—সাময়িক চাপা দেওয়া।

(৫২) তপা—কবর দেওয়া।

(৫৩) এসেৎ—গর্ত অথবা অনুরূপ কিছু আটকাতে এসেদ/এসেৎ।

(৫৪) চুটা—ঐ

(৫৫) এঃুর এনা এবং জরয়েনা—সাধারণ ভাবে পড়ে যাওয়াকে বলে এঃুর এনা কিন্তু যখন সেটা নিরবিচ্ছিন্ন হয় তখন বলে জরয়েনা।

(৫৬) গিতিচ—শোওয়া।

(৫৭) তিচ—লম্বালম্বি পড়ে থাকা।

(৫৮) গের—দাঁত দিয়ে কাটা।

(৫৯) পহাঃক—ঐ

(৬০) কুচিৎ—সংকীর্ণ।

রাচা কুচিৎ এনা, হড়বন সাঁগেয়েনা

তুমদাঃক আচুরবেন বাঁওয়ালিতে (দঙ)

(৬১) চিরেৎ—ভিড় ঠেলে অথবা সংকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করতে গেলে চিরেৎ ব্যবহৃত হয়।

(৬২) কুটাম—কুড়ুল দিয়ে আঘাত করা।

(৬৩) কটেচ—হাতুড়ি দিয়ে পাথর অথবা ঢিল মারা।

(৬৪) চেপেজ/চপজ—চোষা

(৬৫) চাবা—ফুরিয়ে যাওয়া।

(৬৬) মুচাৎ—সমাপ্ত।

(৬৭) কাডা/এহের জিকি—হামাগুড়ি দেওয়াকে কাডা বলে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যখন নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে থাকে তখন বিদ্রুপ করে বলে এহের জিকি।

(৬৮) চাচো—হাঁটি হাঁটি পা পা।

(৬৯) বায়ার কাডা—খোজা করা হয় নাই এমন মোষ।

(৭০) বান্ধাড় সাদম—খোজা করা হয় নাই এমন ঘোড়া।

(৭১) পটম--পুঁটলি বাঁধা (বৃহদাকারের)।

(৭২) রেৎ—ছোটো পুঁটলি।

লাড় সাকাম হেজমে ধুড়ি সিঁদুর রেদমে হরাসি ভোর বাবু সিঁদুরায়মে।

(৭৩) সাড়িম—ঘরের ছাউনি।

(৭৪) সাতে—ছাউনির দেওয়ালের পরের অংশ।

(৭৫) লড়ে/লাঠা—গাছের রসকে লড়ে বলে আবার এই রস দিয়ে যে আঠা তৈরি হয় তাকে লাঠা বলে।

মূল আলোচনায় যাবার আগে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই তা হল বসাকে সাঁওতালি ভাষায় দুড়ুপ বলে কিন্তু গাই গরুর বেলায় বলে বুরুম। কারণ গাই গরুর শোবার ক্ষমতা নাই অপর দিকে আবার পাখীর ক্ষেত্রে দাঁড়ানো আর বসার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নাই বলেই দুড়ুপ বা বুরুম বলে না। বলে আফ। এই বৈচিত্র্য কেবলমাত্র বসার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই, সাঁলতালি ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া এই বৈচিত্র্য অনুধাবন করা যায় না। যাদের মুখের ভাষায় এত বৈচিত্র্য আছে তারা কখনো অসভ্য হতে পারে? পারে না। আসলে এতদিন ধরে যাদের অবজ্ঞা করে এসেছি, অবহেলা করে এসেছি, আদিম, অসভ্য, বর্বর বলে অভিহিত করে এসেছি, বর্তমানের বিচারে তারা একটু পশ্চাদপদ হলেও তারা যে এককালে বেশ উন্নত ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। অপরদিকে এতদিন পর্যন্ত যারা সভ্য বলে দাবী করে এসেছে ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারাই অসভ্য ছিল, এদের সংস্পর্শে এসেই তারা সভ্য হয়েছে কৃষিকাজ করতে শিখে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শিখেছে। ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাসাম ত বলেইছেন, 'On the

other hand they had not developed a city civilization. The complete absence of any words connected with writing in the Rygveda, despite its size and the many context in which such words might be expected to occur, is almost certain proof that the Aryans were illiterate.'

অর্থাৎ, 'অন্য দিকে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার গোড়াপত্তন তারা করেনি। ঋগ্বেদে তার সমর্থনে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই, যদিও সে কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ থাকার কথা। কারণ তার আয়তন বিশাল এবং অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আর্যরা অশিক্ষিত ছিল।' (The wonder that was INDIA, A. L. Basham, P. 33)

তিনি এও বলেছেন, 'The invaders of India called themselves Aryas, a word generally anglicized into Aryans. The name was also used by the ancient persians, and survive in the word Iran, white eire the name of the most westerly land reached by the Indo European peoples in ancient time, is also cognate.'

অর্থাৎ, 'ভারতবর্ষের আক্রমণকারীরা নিজেদের আর্য বলে দাবী করত। আর্য, ইংরেজী আরিয়ান এর অনুরূপ একটি শব্দ। এটা সুপ্রাচীনকালে পার্শিয়ানরা ব্যবহার করত, ইরানে এখনো তার অস্তিত্ব আছে, আবার একেবারে পশ্চিমে আয়ারল্যাণ্ডে সমগোত্রীয় শব্দ ইন্দো ইউরোপীয়ানরাই পৌঁছে দিয়েছিল।' (গ্রন্থ, ঐ পৃষ্ঠা—২৮)

তাদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'About 2000 B. C. The great steppe land which stretches from poland to central Asia was inhabitated by semi nomadic barbarians, who were tall, comparatively fair and mostly long headed.'

অর্থাৎ, খৃষ্টজন্মের ২০০০ বছর পূর্বে পোলাণ্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শুষ্ক, ডালপালা বর্জিত অনুর্বর প্রান্তরে অর্ধ বর্বর যাযাবরদের বাসস্থান ছিল, যারা ছিল লম্বা, তুলনামূলকভাবে উজ্বল এবং উন্নত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট।' (গ্রন্থ, ঐ, পৃষ্ঠা-২৯)

তাদের পেশা ছিল, 'মূলত পশুপালন এবং যৎসামান্য কৃষিকাজ করত।'

'They were mainly pastoral, but practised a little agriculture.'' (গ্রন্থ, ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)

তারা আদি বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বছর পূর্বে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা পশুচারণ ভূমির অভাব হেতু অথবা উভয় কারণেই তারা দলে দলে বিভিন্ন অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের একদল পশ্চিম অভিমুখে, একদল দক্ষিণ অভিমুখে এবং অন্য দল পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।'

'In the early part of the 2nd millennium, whether from pressure of population, desiccation of pasture lands, or from both causes, these people were on the move. They migrated in bands west words, South wards and East wards, conquering local population, and inter marrying with them to form a ruling class.' (গন্থ ঐ, পৃষ্ঠা—ঐ)

ঋগ্বেদ উল্লেখিত সুর এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ থেকে এরকম অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, ভারতবর্ষে আগমনের পর আর্যদের সঙ্গে ভারতের আদিম অধিবাসীদের সংঘর্ষ বাধে এবং এই সংঘর্ষে আর্যদের কাছে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিতদের সবাই আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। যারা বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তারা সবাই বিজয়ীর দাস হিসেবে গণ্য হলেন। কারণ সুপ্রাচীন কালে পরাজিতরা বিজয়ীর দাসে পরিণত হবেন এটাই নিয়ম ছিল। বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথার চতুবর্ণের চতুর্থ বা শেষ বর্ণ শুদ্র পরাজিতদের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা যা কিনা আর্যদের বলে দাবী করা হয় সেটা গড়ে তুলেছিলেন বর্ণাশ্রম প্রথার চতুর্থ বা শেষ বর্ণ কারণ বর্ণাশ্রম প্রথায় বর্ণিত প্রথম তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেবা করত শুদ্ররাই, উপরোক্ত তিন বর্ণের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাজই ছিল না। অপরদিকে যারা বশ্যতা স্বীকার করেননি তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালে অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ নামে পরিচিত স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে এবং এরাই সাঁলতালদের পূর্বপুরুষ বলে পরিচিত হন।

সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা

সাহিত্যের ভাষায় এবং মুখের ভাষায় সামান্য পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য ইংরাজীতে আছে বাংলায়ও আছে, কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় এই পার্থক্য নাই। তবে

ইদানীং দু একজন ক অক্ষর গোমাংস, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল এই পার্থক্য তৈরি করার জন্য, প্রমাণ করার জন্য আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছেন। গান, ছড়া, লোকগাথা এবং কাহিনী ইত্যাদি যদি সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয় তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা আদিকাল থেকেই চলে আসছে, তবে লিখিত ভাবে সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চা খুব বেশি দিনের নয়। লিখিতভাবে সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় বেনাগাড়িয়া ব্যাপটিস্ট মিশনের অবদান অপরিসীম এবং এই ব্যাপটিস্ট মিশনেই লিখিতভাবে সাহিত্য চর্চার পথিকৃত। সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে P.O. Bodding এবং Andrew Campbell এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। তাঁরা উভয়েই বহু পরিশ্রম করে সাঁওতালদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু গান, ছড়া, লোকগাথা, কাহিনী, ধাঁধা ইত্যাদি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বাধীনতার উত্তরপর্বে সাঁওতালি ভাষার সাহিত্যাকাশে একঝাঁক সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ড: ডমন সাহু 'সমীর'। Wordsworth কে কেন্দ্র করে ইংরেজী সাহিত্যে যেমন একঝাঁক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল ডমন সাহুকে কেন্দ্র করেও অনুরূপ একঝাঁক নক্ষত্র সাঁওতালি ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের রচনা ঋজু এবং সাবলীল। আবহমান কাল ধরে বেয়ে চলা নদীর ফল্গুধারার মত সদাই গতিশীল। তাদের সবার রচনাকে এখানে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কেবল তাঁদের যোগ্য উত্তরসুরী আধুনিক যুগের দুজন অমর কথাশিল্পীর বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ভগ্নাংশ মাত্র তুলে ধরছি। প্রথমে রূপচাঁদ হেম্ব্রমের কথা উল্লেখ করে পরে সোনা হেম্ব্রমের কথায় আসছি। রূপচাঁদ হেম্ব্রম সাঁওতালি ভাষার একজন স্বনামধন্য কথা শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত কিন্তু গদ্যের মত পদ্যেও যে তিনি সমান স্বচ্ছন্দ, নিম্নলিখিত রচনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

'পারগানা'

(পরগণার শাসনকর্তা)

রায়বার ইনাবার ঢেঁশকেদায় গুরুবার
অনারেয়াঃক দরবার তায়মতেদ ছারখার
নডেচং, হাঁডেচং, ইএঞচং, হানিচং,
অজহাকোওয়াঃক কাথাতে হেঁচং, বাংচং
গড়মবা খুটরে অডকএন খুশিদ
হেঁ রেহঁ, বাংরেহঁ নেহড়গে দুশিদ।

সুনুমরে সাকামরে খাড়িরে সিনাম
অজহাকোকো এ্ঞামকেদা ইএ্ঞাঃকগে মুঠান।
কামিরে, কুড়াইরে, স্যো সিঞরে, ঞিদারে,
কিযাঁড় বঙ্গা জানিচ জাঁপাড়েন ইএ্ঞরে
বাংইএ্ঞ রেবেনরে বতএচন জানঠেন,
নঙ্কাগে আরিচালি অকয় চেৎ এয় মেন।
উনখন বাপধন মন ইএ্ঞাঃক ভাঙ্গিয়েন
বারবেড়া সোরপেড়া মানেতেক সাগিএ্ঞএন।
নাওয়া পেড়া কুশিকাতে আকতেক লাহালেন,
সুনুম ঠঁগা সাকাম বঙ্গা বতরতেক সাহায়েন
ইএ্ঞ মাহো গুনী গরীব ঞুৎগিএ্ঞ বেঁগেৎ কেৎ,
বাএ্ঞ বাড়ায় সমাজ গাডায় বুহেলিএ্ঞ অকাসেৎ?
আপেগেহো দিহরি মা মাজহি পারগানা
সমাজ বেয়াঃক আরি মা আপে তিরে মেনাঃক।
অনাহঁ দহায় বাতে হাপড়াম ধরম,
ওড়গো পোড়গোপে কাড়গো পারম।
বাংখান চেদাঃক তেহেএ্ঞ জাজিলমান আরি।
সারিয়ান এড়ে কাতে এড়েয়াঃকপে সারি।
বাড়িচলেন রেপে দুসাও হাপড়াম লেঠা,
নাপায়ঃকরেদ আপে কড়ামপে চেটাগ।
আরিরেপে জারিয়েদা বড়ে রাজআরি,
আতোরেপে সিরজাওএদা বয়হা খাপারি।
বাংপে লুতুরাঃকহো নে হড়াঃক এগের,
সমাজরে লাদেঃক কানা হামাল গেমের।
থুকুম হো পারগানা মা পেড়াদ এ্ঞামকম
সারজম, মাতকম, বাচকম, পারকম,
তালে খিজুর আর কিতা পাটিয়া
হাঁড়ি এ্ঞু লাগিৎ চুঁকড়ুচ টাটিয়া।
বানিজ দহ মেনাঃক পেড়া দারাম
সমাজরে সাগুন ইতা আমগে এরাম।

বায়বার সেইবার
বিধান দিল বেশপতিবার।
সেই নিয়ে দরবার
তারপরেই সব ছারখার।।
এখানে, ওখানে অথবা
আমি সে যেই হউক।
ওঝাদের কারসাজিতেই
হোক চাই, না হউক।।
পিতামহর সাতকুলে
দেখা দিল খুঁতযে।
সত্য হউক, মিথ্যা হউক।
নিজেই ত দোষী যে।।

শুকনো পাতায় তেল পড়া
ওঝা দিল রায়।
অপরাধী তুমি নিজে
অন্য কেহ নয়।।
দিবারাত্র অহর্নিশ
কাজে কিম্বা ভোজে।
লক্ষ্মী (দেব) দেবীর আর্শিবাদ
তুমি লভিয়াছ।।
গররাজী হচ্ছি দেখে
জান দুয়ারে ছুট দিল।
এটাই রীতি নীতি
আমায় মেনে নিতেই হল।।

সেই থেকে মন আমার
ভেঙ্গে গেল বাপধন।
খবর শুনে কেটে পড়ল
আত্মীয় স্বজন।।
নতুন নতুন আত্মীয় জন
যাদের ছিল মন।

বঙ্গা সংবাদ শুনতে পেয়েই
ভঙ্গ দিল রণ।।
গরীব আমি দুঃখে আমার
চোখে সর্ষে ফুল দেখি।
কে জানে কোন অতল তলে
তলিয়ে আমি যাবো কি?

ন্যায়ালয়ের ন্যায়মূর্তি
তোমরা সমাজপতি।
ন্যায় অন্যায় নির্ধারণের
ভার তোমারে হাতই।।
কিন্তু কেন অতীত দিনের
ধর্ম দোহাই দিয়ে।
নিজের গড়া নিয়ম ভাঙ্গো
বলতে পার কি হে?
তা না হলে আজ কেন ঐ
শক্তিশালী মত, প্রথা।
মিথ্যা কেন সত্য
আবার সত্য কেন হয় মিথ্যা?

খারাপ কিছু ঘটলে পরে
দুষ বিধির বিধান দান।
ভাল কিছুর আবির্ভাবে
ম্লান কেন হয় অম্লান?
নীতি কথার নামে কেন
জারি কর দুর্নীতি।
ভাই এর সঙ্গে ঠাঁই কেন নয়
কেন কর রাজনীতি?
করলে পালন সুবোধ বালক
অন্যথায় জোটে লাঞ্ছনা।।

পারগানার শ্রীচরণে
নিবেদন ইতি।
শুভস্য শীঘ্রম তব
করি মিনতি।।
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়র
আয়োজন মেলা।
দিয়ে মনে অন্বেষণ
কর এই বেলা।।
পার যদি ক্ষমা কর
তব নিজ গুণে।
অধমের ইত্যকার
আবেদন শুনে।।

উপরে উল্লেখিত রচনাটি রূপচাঁদ হেম্‌ব্রমের দলবৃত্ত ছন্দের একটি অনবদ্য রচনা। সাঁওতালি থেকে বাংলায় তর্জমা আমার নিজের। সাঁওতালি ভাষায় আমি বেশ দুর্বল, তার উপর আবার কবিতার অনুবাদ! তাই আমার মনে হয় অনুবাদে কবিতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ঘটকালি করাকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'রায়বার'। কবিতাটির নামকরণ পারগানা হলেও ঘটকালি নিয়েই বিভ্রান্তির সূত্রপাত। হিন্দুদের কাছে ঘটকালি পেশা হিসাবে গণ্য। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে মোটেই তা নয়। রায়বার সম্বন্ধে কবি রূপচাঁদ হেম্‌ব্রমের উপলব্ধি রায়বার সৃষ্টির কারিগর, নবজীবনের প্রতীক, ভবিষ্যতের দূত। সে কথাই পারগানা কবিতায় আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে। এই উপলব্ধিই পারগানা কবিতার বড় পাওনা।

এখন সোনা হেম্‌ব্রমের কথায় আসছি।

'ধন তাঁহেনতে নাচার'

গিদরা বাসিয়াম। জিনতি পিপিড় জিউঈয়ান সানামকগে আপান আপিন জিয়ন বাঞ্চাও লাড়াহাইরে করিঘাম। বাস গাডীরে তোবেতআতে হড়। গাডী তা পিসতেয় ঞিরাঃক কানা। যুদা জায়গারেন যুদাওয়ান হড় অকয় অকাচক সেনঃক আঁপড়েগেক বাডায়া। হড়মরে হয়গে বাং লাগাঃক কানা। ধারতীরে হয় মুচাৎ হিজুঃক কান লেকা। গাডী ভিতার এলাং আঁগরা সেঁগেল মেনাঃক সিক। হড়ময় ভাপাও এদা। ভাপাও উদ্গার লল। সেরমা মেৎদাঃক বায় জরঅ আকাদা। ধারতী আকাব সাকাব। মনে হুয়ুঃক কানা ধারতী চেতান সেঁঙ্গেল আরেল জাড়িতে ধারতী মানওয়াদয় গচ মারাও কওয়া। কুঞ, টিউবওয়েল/ঢেংকচ রেয়াঃক দাঃক সোত সাহারদ লাতার আকান।

বাসরেন সানামকগে উদগারতে বরাম। অকয়দ তিরেয়াঃক উদুঃক কাটুপতে খান অকয়দ উরমালতে স্যে আরইঁ আঁগরপ রেয়াঃক তি দাবি লুগড়িচতে মলং মুখানবেয়াঃক উদগার দাঃকক জদেৎ তাকাওয়া। ভীড় খাতির অকয়দ মেৎ মুখানরে তিগে বাকো ইদি দাড়েয়াঃক কানা। অনকান হড়াঃক মলং মুখান করেদ সেতাঃক শিশির দাঃক লেকা উদগার টলমলঃক কানা। যাকে যেমনাঃক মচা করে রেহড়া হাসা রাহামগে লেকা উদগার লুটি চেতানতে সড়অ বলঃক কানা।

কুঠিন ঠেলাও ঠেপেলাও। গাড়ী তিনাঃকএ ঞিরাঃক কানা বেরইঁ উনাঃকগে ঠিক তিকিন স্যেচএ মহড়া আকানা হেপরাওঃক কান লেকাকিন। হেঁ এন্তে থিরদ অকয়ে তাঁহেনা? জিউঈ বহেজঃকগে ধরম। বেড়হায় রেয়াঃক ধরম লেকাতে সানামাঃকগে চালাওঃক কানা খাসাওঃক কানা। আর অনাতে নাসেরেইঁ আরু ফেরাঃক কানা। নওয়া আরু ফেরাওগে সভ্যতা।

গাড়ী ধামপড় গদঃকরে হড়ম রেয়াঃক বজ হামাল ঠিক দহয়রে অকা অক্তদ এটাঃক হড়মরে টেহাড পাড়াঃকআ।

কুড়ি হপন বিদালরেইঁ অনকাগে। মেনখান কড়া কুড়ি খানগে সাম্বাড়ও আরইঁ। চেদাঃক স্যে কড়া কুড়ি হড়ম ভিড়াও লেনখান তার রেয়াঃক Negative Positive যে লেকা অনকাগে হোয় বাড়িজঃকআ।

মলং মুখান রেয়াঃক উদগার দাবিতে জৎ এনাঞ চিঁকাড় মলং—দুড়ুপ জায়গাহঞ ঞামকেদা। মিৎ ঘাড়ি তায়ম ইঞাঃক লুতুর সোররে অকয় চয় রড় কেদা, স্যার আপনি? এই বাসে, ভাল আছেন ত? বহঃক ভুল কাতিঞ ঞেলেয়াদ মিৎ সান্তাড় হড়। উপরুম গেয়ালিঞ, মেনখান সতাসংদ বাং। তাঁহেন আর চাকরী কামিইঁ তালিঞ হাঁড়ে নাড়ে আদ, কবিগুরু সাধু রামচাঁদ মুরমু আঃক কাথাশিক ঃ

দেশ দিশম কুড়ি কড়া,
আদিবাসী যতগে পেড়া।
যাঁহাতিস, যাঁহারে সাগিঞ হর ঞাপাম।
রাসকা, রপড়াব দুকব রপাম।।

হোই অনকাগে, অকয় অকারেন কানালিঞ—আদিবাসী হতেচতে উপরুম। যাঁহাতিস ঞাপামঃকরে রড় রপড়তালিঞ। লেঁগা তারেনরে মিৎটাং লুগড়িচ রেয়াঃক থুলয়াঃক। হামালগে। হোই চেৎ চং যাঁহানাঃক পুথি পতব গেচং অনাদ আয় উমানাঃকগে। আদ অনকান ঞুতুমান হড়ঠেনদ অনকানাঃক বেগর চেৎ তাঁহেনা, 'নক্কাগে আপিস বাবুইঁ কানায়।

হাহাড়াঃক এনাঞ সান্তাড় হড় দিকু পারশিতে চাঃকএ কুকলিঞ কানা? মিৎ ঘাড়ি আয় উমান রেয়াঃক কুরুমুটু কেদাঞ। উনাঃক হড় গাদাল তালারে হড়তে

রড়দ পালেনে লাজাঃক কানা। পালেকো বাড়ায় বতেচকেয়া উনিদ সান্তাড় হড় মেন্তে। আদ বাম রড় রেহঁ মহডা রেগেম বাড়ায় অচঃক কানদ। হেঁ চং আচ সাঁওতে দিকু পুষি গাতেক তাঁহে কানা স্যে বাং অনাদ হাঁঃক অহঞ মেন দাড়ে কেয়া। মেনখান দিনাম হিজুঃক সেনঃক মিৎ বার কড়া কুড়ি সাঁও উপরুমদ তাঁহে দাড়েয়াঃক গেয়া।

উপরুমদ চেৎচং মেনাঃকআ, মেনখান উনাঃক ঞুতুম পারিশ হাবিচদ বাং— এনে মেৎ ঞেপেল উপরুম। দিকু পুষি কঠেনদ যাঁহাঃকগে মেনখান হড় হপনঠেন আডিগে ঞুতুমান, জাতি সমাজ দরদিয়া। দিনাম লেকাগে উনিঠেনদ অনলিয়া, অনড়হিঁয়াকো হেচ বাড়াঃকআ। ঞতুমান হড় হতেচতে এটাঃক পারসিরেন খবরিয়া কহঁ উনিয়াঃক Interview ক হাতাও বাড়ায়া। ইঞদ এন্তে আলগেল হড়। সাহিত্যরেয়াঃক উনাঃক চেৎহঁ বাঞ বুঝাওয়া, মেনেখান নওয়াঞ বুঝাওয়া বলে আপনারাঃ জানাম পারশি তাঁহেনতে এটাঃক জাতাঃক পারশিতে রড়তেদ সাবাসিঃক রেয়াঃকদ চেৎহঁ বানুঃকআ। পারসি মান মহৎহঁ বাং রাকাপ বদলতে নিকমঃকআ। আর নক্কা কাতেগে জানাম রড় আড়াং আদঃকআ। অনে নাহাঃকমা অকয়কদ হড় সেবেঞ ক্যাসেটক অডক এদা, যাঁহা ক্যাসেট করেনাঃক রু, রাড়কদ হড় হপনাঃক সেরেঞ রু, রাড় সালাঃকদ বাং জুরীঃক কানা। অনাকরেদ লাড়ে লাপ্পা হিন্দি সেরেঞ রু রাড় রেয়াঃক হাওভাব মেনাঃক আ। নওয়া বেগর সমাজ সেরওয়া রড় সাগাই হিড়িঞ বাগি কাতে আপনার কুশিতে রড় সাগাই চল লেখান সেরওয়া সাগাই ঘাওদ দারদারাঃক গেয়া। আদ নক্কান হড়কদ জাত তাম ধরম তাম লঃক তাম ঠুঃকতাম বাংক বাড়ায়া চাই মানিমান।

হড়তেগে ররড় সানাকিদিঞা। মেনখান উনিয়াঃক মান দহয় লাগিৎ দিকু তেগেঞ রড় আদেয়া। মনেদ বাং ভারতিঃক কানা বাঞ কুশিঃক কান গেয়া। হুদিশেৎ কানাঞ জানাম রড়তে রড়দ 'জুদা গেয়া', নওয়াহঁ মনেরে উক বুকাও এনা 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃনসম দহে', এনখান ইঞহঁ অনা থকরেনগিঞ হুয় এনদ।

মাড়াং রেগিঞ মেন আকাদা, ইঞদ আলগেল মিৎ হড়। অনলিয়া অনড়হিঁয়া, সাসাপড়াওগমকে, সুসারিয়া পঁডেত হড়ক লেকা ঞুতুমান হড়দঞ বাং কানা। অনাতে যে হিসাবতে স্যার মেন কাতে দিকুতেয় রড় আদিঞ ইঞদ বাঞ কুশি সাত লেনা। দমে তেৎগিঞ লাজাও পাড়াও এনা। 'স্যার' ইঞঠেনদ কিরিঞতে ঞামঃক গোবর গ্যাস সারগিঞ মনেকেদা। চেদাঃকস্যে Sir মেন হচঃক হহ হচঃক হড়মাঞ বাং কান, অনাতে অপমান কিদিঞ লেকাঞ আটকার কেদা, আর যাঁহায় স্যার মেনলেক কানাক, অনা রড় রাহা আড়াংদ যুদা গেয়া।

বাঞ বুঝাও দাড়েয়াঃক কানা যে, নক্কান ঞুতুমান হড়। যাঁহায় চেতানরেদ সান্তাড়ী সাহিত্য তরাও রাকাপ ভারিয়া মেনাঃক আকাদা উনিদ হড় তুলুচ হড়তে চেদাঃক বাংএ রড়া? নক্কান হড় আতে খাঁটি সাহিত্য পারশি সেওয়া গানঃকতে?

এটাঃক পারশিতেয় রড়েততে থড়া হড়দক সাবাসি দাড়ে আয়া। আর আয়মা সান্তাড় বেগরহঁ এটাঃক পারশিরেন হড়দ লেলহা মুরুখ হড়ক মেতায়া। আদ এনখান মেন বাং খানদক চেদাক স্যে অকা যুগরেন মানওয়া 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধক' মেনেৎ কানা অনা যুগ পিড়হিরেন অলঃক পাড়হাঃক বাডায়ান হড় সান্তাড়কদ এটাঃক পারশিতেয় ররড় কানা। মাসে অকা লেকা হদিশ?

আদ হাঁঃক নক্কান হড়গে লাটু লাটু কথাক রড়া, জাত সমাজ চেতান দরদক উদুগা। এহো নওয়াকদ ঋত এড়ে ভড়ং কানা। বহঃকরে নওয়াক গুরলাউ সাঁওতে বহঃক ললয়েনতিঞা। উনি স্যেচ কয়ঃক কাতে রাগাৎ আড়াংতিঞ মেন কেদা, হড়দবন চাবা হেচ আকানা, অনাহঁ আব তেগে। মেনখান ইঞ বাং উরুমিঞ লেকা চেৎগে বাংএ রড় রুওয়াড় লেদা। সোর সোপোর তাঁহে কাতেহঁ আডি সাগিঞ রেগে মেনাঃকলিঞা আটকার কেদাঞ।

বাড়ায়কিদাঞ ধন তাঁহেনতে নাচার আকানাবন নক্কান হড় খাতিরগে।

'সব থেকেও কিছু নেই'

সবে বাচ্চাদের জল খাবারের সময় হয়েছে। পৃথিবীর বড় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জীব জীবন সংগ্রামে নাজেহাল হয়ে উঠেছে। বাসে উপচে পড়া ভীড়। গাড়ী ছুটছে ত ছুটছেই। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বিভিন্ন অভিমুখে যাত্রা করেছে। কে জানে কোথায় যাচ্ছে? গায়ে এতটুকু হাওয়া লাগেনা। মনে হয় পৃথিবীর সব হাওয়া, হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। বাসের ভেতর অসহ্য গরম। মনে হচ্ছে যেন কে বা কারা বাসের ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গরমে শরীর ঝলসে উঠছে। গরম, ঘাম, দাবদাহ। আকাশে বৃষ্টির ফোঁটার দেখা নাই। পৃথিবীর বুক ধড়ফড় করে। রৌদ্রের তেজ দেখে মনে হচ্ছে আগুনের গোলা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকেই মেরে ফেলবার চক্রান্ত হচ্ছে। নদী নালা, খাল বিল, কুয়ো, পাতকুয়ো মায় টিউবওয়েলের জল পর্যন্ত তলানিতে এসে ঠেকেছে।

বাস যাত্রীদের সবারই, শরীরের সবটাই ঘামে ভেজা। তাদের কেউ কেউ হাত দিয়ে ত, কেউ রুমাল দিয়ে আবার কেউ জামার হাতা দিয়ে ঘামের জল মুচছে। আবার অনেকেই ভীড়ের ঠেলায় হাতই সোজা করতে পারছে না। সকালে সূর্যের আলোয় শিশিরের বিন্দু যেমন টলমল করে ওঠে তাদের কপাল এবং মুখের ঘামের বিন্দুও তেমনি টলমল করে উঠছে। কারো কারো আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম কপাল

থেকে নাক চোখ বেয়ে সোজা মুখে এসে ঢুকছে, যার স্বাদ নুন গোলা জলের মত নোনতা।

প্রচণ্ড ভীড়ে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি লেগে যাচ্ছে। ওদিকে মহাকাশে সূয্যি মামা আবার বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঝ আকাশের দিকে দৌড়াচ্ছে। সত্যিই তো চুপ করে কেই বা আর থাকবে? এগিয়ে যাওয়াই ত প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই সবাই, সব কিছুই চলছে আবার খসেও পড়ছে। এর ফলেই পরিবর্তিত হচ্ছে, আর এই পরিবর্তনের নামই তো সভ্যতা।

ব্রেক কসবার ফলে গাড়ি দুলে উঠছে ফলে গাড়ি ভর্তি মানুষ এ, ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। তবে ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেই অসুবিধা। কারণ বিদ্যুৎ বাহিত তারের মত Negative Positive এক হবার ভয় থাকে।

চোখ মুখের ঘাম হাতের তালু দিয়ে নয় বাহু দিয়ে মুছে ফেললাম। ইতিমধ্যে বসবার জায়গাও পেয়ে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই কে যেন পেছন থেকে আমার কানের কাছে মুখ এনে বিড় বিড় করে উঠল, স্যার, আপনি এই বাসে? ভালো আছেন তো? চোখ কপালে তুলে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি আমারই স্বজাতি, একজন সাঁওতাল! পরিচয় আছে বটে তবে একসঙ্গে যাওয়া আসা নেই। চাকরি এবং বাসা বাড়িও তাই। কিন্তু ঐ যে, কবিগুরু সাঁধুরাম চাঁদ মুরমু বলেছেন :

বিদেশ বিভুঁয়ে যদি
কোনোদিন কোথাও,
হয় দেখা সাক্ষাৎ
আমাদের হঠাৎ।
আদিবাসী নরনারী
নিকট কি দূরের
মনখুলে কথা বলে
দুঃখ ঘুচাব।।

আমাদের অবস্থাও তাই। কে কোথাকার জানি না। কেবল আদিবাসী বলেই চেনাজানা। কোনোদিন কোথাও দেখা হলেই কথা বলি। বাঁ কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী কাপড়ের থলে। দেখে মনে হয় বেশ ভারি। বোধহয় বইটই হবে। ঐ রকম নাম ডাকওয়ালা লোকের সঙ্গে বই ছাড়া আর কিই বা থাকবে? লেখাজোখা ছাড়াও অফিসে কাজ করে।

সাঁওতাল হয়ে বাংলায় কথা বলতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে ভাবতে লাগলাম এত লোকের সামনে মাতৃভাষায় কথা বলতে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে, যদি কেউ জানতে পারে যে, সে সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত। কিন্তু চেহারা দেখেই ত লোকে তাকে চিনে নিয়েছে যে সে সাঁওতাল বলে। সঙ্গে তার পরিচিত কেউ আছে কিনা সেই জানে। নিত্যদিন যাতায়াতের ফলে পরিচয় হতেই পারে।

পরিচয় হয়ত আছেই তবে ঘনিষ্ট পরিচয় বোধহয় নাই। ভিন জাতীয়দের কাছে সে যাই হউক নিজের লোকজনের কাছে সে স্বজাতি এবং স্বীয় সমাজ দরদি হিসাবে প্রচণ্ড রকমের নামকরা। তাঁর সঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং নিত্য যাতায়াত আছে। বিখ্যাত হবার জন্যই অন্য ভাষার সাংবাদিকরাও তার Interview নিয়ে থাকে। অন্যদিকে আমি একজন হাবাগোবা লোক। সাহিত্যের অতকিছু বুঝিনা, তবে এটুকু বুঝি যে, নিজের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় কথা বলার মধ্যে বাহাদুরি কিছুই নাই। তাতে ভাষার মর্যাদা ত বাড়েই না বরং খাটো হয়, এবং এইভাবে মাতৃভাষা হারিয়ে যায়, লুপ্ত হয়। অনেকেই এখন সাঁওতালি গানের ক্যাসেট তৈরি করছে। কিন্তু সাঁওতালি গানের সঙ্গে ক্যাসেটের তাল, লয়, ছন্দের মিল নাই। ক্যাসেটের কলের গান লাড়ে লাপ্পা হিন্দি গানের হুবহু অনুকরণ। এই রকম ভাবে নিজের Tradional এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যের সৃষ্টিকে আপন করে নিলে সমাজ জীবনে ঘুণ ধরতে বাধ্য। এই সব লোকের কাছে ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং Tradional সমাজ সংস্কৃতি, গোল্লায় গেলেও কিছুই যায় আসেনা। এদের চাই মান সম্মান তা সে যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হউক।

মাতৃভাষা সাঁওতালিতেই জবাব দেব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু পাছে তার সুনাম হানি হয় তাই বাধ্য হয়ে বাংলায় উত্তর দিলাম, কিন্তু মনের ভেতরটা ছ্যাঁক করে উঠল, এই কথা ভেবে যে 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ', 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে' কথাটা মনে হতেই মনটা ছটপট করতে লাগল। অন্যায় কারীকে অন্যায় কাজে মদত দিয়ে নিজেও ত অন্যায় দোষে দুষ্ট হয়ে পড়লাম।

আগেই বলেছি আমি লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সংবাদপত্রের সম্পাদক কিম্বা সমাজ সেবীদের মতন পণ্ডিত ব্যক্তি নই। আমি নেহাতই হাবাগোবা। তাই 'স্যার' ডাক শুনে বেজায় লজ্জিত হলাম। 'স্যার' আমার কাছে হাটে বাজারে কেনা সার বলেই মনে হল। কারন 'Sir' সম্বোধনের উপযুক্ত আমি মোটেই নই। তাই স্যার বলে আমাকে অপমানিত করা হল বলেই আমার মনে হল। তাছাড়া যারা স্যারের উপযুক্ত তাদের সম্বোধনের বাকভঙ্গিই আলাদা।

আমি বুঝতে পারছি না, এমন নামকরা লোক, যার কাধে সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য চর্চার গুরুভার অর্পিত হয়েছে সে কি করে মাতৃভাষাকে অবহেলা করে একজন সাঁওতালের সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলে? এই ভাবে কি সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যের উন্নতি হবে?

মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে দেখে কেউ কেউ তার পিঠ চাপড়ে দিতেই পারে কিন্তু অনেকেই তাকে ক অক্ষর গোমাংস বলবে। আর বলবে নাই বা কেন বলুন ত? এখন ত মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধের যুগ। সেই যুগের একজন লোক হয়ে তিনি মাতৃভাষাকেই অবহেলা করছেন। ভাবুন, তার বিচার বুদ্ধি কেমন?

এরাই আবার স্বজাতির প্রতি দরদ দেখিয়ে সমাজসেবী বলে পরিচয় দিয়ে লম্বা চওড়া ভাষণ দেবে। ওহে এরা সব কালকা যোগী, বকধার্মিক। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মাথায় খুন চেপে গেল। তার দিকে পিছন ফিরে রাগে গরগর করতে করতে বললাম, আমরা শেষ হয়ে এসেছি, তাও আবার নিজেদের দোষেই। কিন্তু সে আমাকে না চেনার ভান করে আমার কথার কোন উত্তরই দিল না। এত কাছে অথচ মনে হল আমরা অনেক অ-নে-ক দূরে।

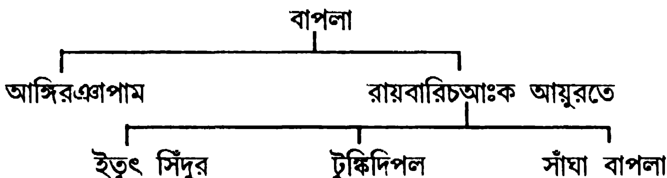
তখন বুঝলাম এদের জন্যই আমাদের সব থেকেও কিছু নেই। (বাংলায় রূপান্তর আমার নিজের)

আলোচ্য 'ধন তাঁহেন তে নাচার' রচনায় লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যে কত নিখুঁত ক্ষুদ্র পরিসরে তা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই রচনাটিকে অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। সাহিত্যিক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তিনি কিছু পাবার আশায় অথবা কোনো কিছুর বিনিময়ে লেখেন না। লেখেন তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে। তাই তাঁকে হতে হয় আপোসহীন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এক কঠিন কঠোর বাস্তব সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বাস্তব সত্য হচ্ছে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা। এটা কারো ব্যক্তিগত সমস্যা নয় সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যার শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত সেটা বোঝা যায় যখন দেখি অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যার নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সে নিজেই অবক্ষয়ের শিকার। অবক্ষয়ে আক্রান্ত হয়ে নিজের আসল পরিচয়কে চাপা দেওয়ার জন্য মাতৃভাষা সাঁওতালির পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলেন। এই উপলব্ধি লেখককে আহত করে, তার মনে আঘাত লাগে। সেই আঘাত যে কত গুরুতর লেখক তা এক কথায় প্রকাশ করেছেন। ইংরেজী 'স্যার' যার অর্থ মহাশয়, সেই স্যারকে তার মনে হয়েছে হাটে বাজারে অর্থের বিনিময়ে বিনিময়যোগ্য পণ্য, সহজলভ্য বর্জ্য পদার্থ সার হিসাবে। এখানেই রচনাটি সার্থক হয়ে ওঠে।

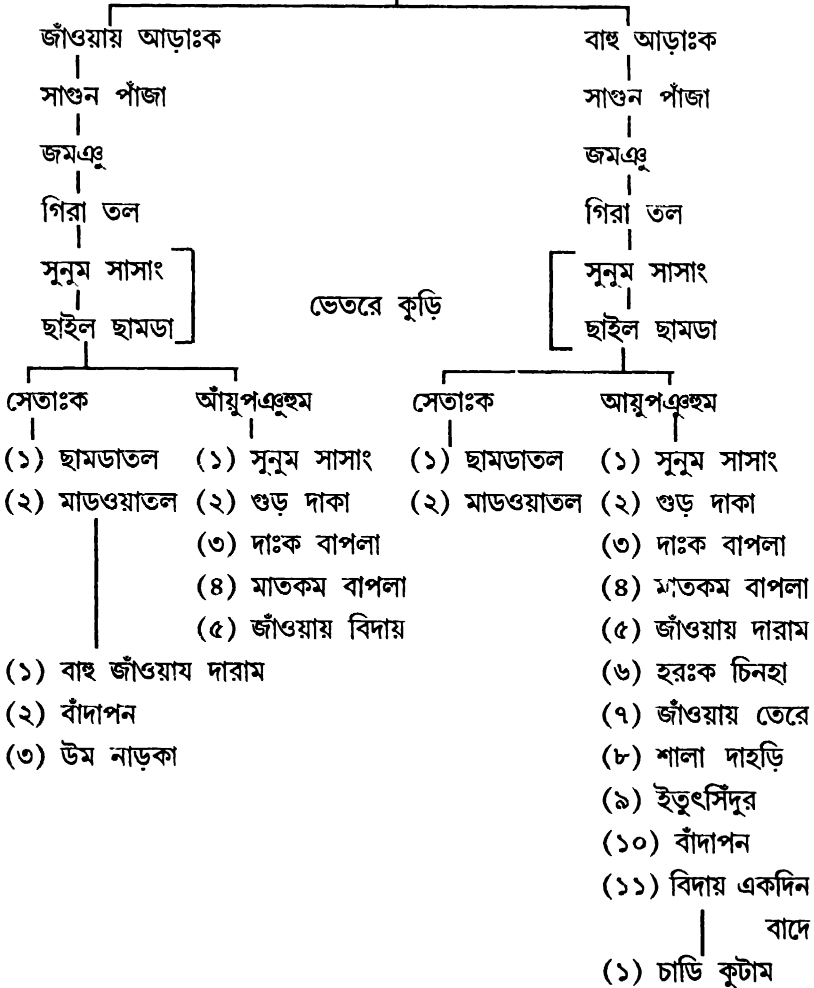
অন্য ভাষায় কথা বলায় দোষের কিছু নেই, কিন্তু নিজের মাতৃভাষার বর্তমানে নিজের পরিচিত স্বজাতির সঙ্গে অন্য কোন ভাষায় কথা বলার অর্থ সব থেকেও কিছু নাই। এখানেই নামকরণের সার্থকতা।

বাপলা

বিয়ে এক ধরনের সামাজিক বন্ধন। মানুষ কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিয়ে করে না, বিয়ে করে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অন্তত আমাদের এই ভারতবর্ষে তাই। সাঁওতালদের মধ্যে দু প্রকারের বিয়ের প্রচলন আছে। তাদের একটাকে বলে আঙ্গির এ্রাপাম অর্থাৎ প্রেম করে বিয়ে এবং অন্যটাকে বলে ইতুৎ সিঁদুর বাপলা যেটা রায়বার অর্থাৎ ঘটক বা ঘটকালির মাধ্যমে সংঘটিত হয়।



নিজেই নিজের জীবন সঙ্গিনীকে বেছে নেওয়াকে বলে প্রেম করে বিয়ে সাঁওতালি ভাষায় আঙ্গির এ্রাপাম। ইদানীং ভারতীয়দের মধ্যে যার ব্যাপক প্রচলন দেখছি, সেই প্রেম করে বিয়ে করার রেওয়াজ সাঁলতালদের মধ্যে আদি অনন্ত কাল থেকেই স্বীকৃত এবং বহুল প্রচলিত। কিন্তু সবার যোগ্যতা সমান নয়, সবাই যে নিজের জীবন সঙ্গিনীকে বেছে নিতে পারবে তাও নয়, তাহলে তারা কি চিরকাল অবিবাহিত, চিরকুমার হয়ে থাকবে? কিছুতেই নয়। তাদের জন্যই ঘটকালির মাধ্যমে বিয়ের ব্যবস্থা আছে। আমি আগেই বলেছি ঘটকালি সাঁওতালদের কাছে পেশা হিসাবে গণ্য নয়। প্রয়োজনের তাগিদে যে কেউ ঘটক হতে পারবে। ঘটক বা ঘটকালি অর্থাৎ রায়বারের মাধ্যমে সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় তিন রকমের বিয়ে প্রচলিত আছে। সেই তিন রকমের বিয়ে হল প্রথমত ইতুৎ সিঁদুর, দ্বিতীয়ত টুঙ্কি দিপিল এবং তৃতীয়ত সাঁঘা বাপলা। এই তিন রকমের বিয়েকেই ক্রমানুসারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ইতুৎ সিঁদুর এবং টুঙ্কি দিপিল বাপলার ক্ষেত্রে প্রথমে বাইরে বাইরে পাত্র পাত্রীকে বাড়ির কর্তৃস্থানীয়রা দেখে নেয়, পছন্দ হলেই চেনাজানা কাউকে অথবা নিকট আত্মীয়দের ঘটক হবার জন্য বা ঘটকালির জন্য অনুরোধ করে বা আবেদন জানায়।



ইতুৎ সিঁদুর বাপলা

বিয়েতে দুটো পক্ষ হয়। একটা বরপক্ষ এবং অন্যটা কনেপক্ষ। সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের মত বরপণ কোনদিনই ছিল না এখনো নেই, তাদের মধ্যে আছে কনেপণ, আবার কনে পণের মত সাঁওতালদের মধ্যে কেবল কনে খোঁজার নিয়ম আছে হিন্দুদের অনুরূপ বর বা পাত্র খোঁজার নিয়ম নাই। প্রথমে বাড়ির কর্তৃস্থানীয়রা

হবু পাত্রীকে প্রকাশ্যে নয় বাইরে বাইরে দেখে নেয়, কনে অথবা কনের বাড়ির লোকজন সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। পছন্দ হলেই রায়বার বা ঘটককে সেই কথা জানায়। এইবারে রায়বার কনের বাড়িতে গিয়ে কেবল কনের মা বাবাকে সেই কথা বলে। তারা বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে সম্বন্ধ পাততে রাজী হলে রায়বারকে হ্যাঁ বলে। রায়বার তখন সেই কথা বরের বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দেয়। উভয় পক্ষ রাজী হলে শুভলক্ষণ দেখা হয়। সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে সাগুন পাঁজা। এটা হিন্দুদের কুষ্ঠিবিচারের মত। সাগুন পাঁজা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল তা হল, পরিবার সমাজ নিয়ে বসবাস করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সবার সঙ্গেই কোনো না কোনো সম্বন্ধ তৈরি হয়। সমাজজীবনের এই সম্বন্ধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুয়ের একটা হল রক্তের সম্বন্ধ এবং অপরটা পাতানো সম্বন্ধ। এই পাতানো সম্বন্ধীরা বা আত্মীয় স্বজনরা সাধারণত কাছাকাছিই থাকে, এদের বাড়িঘর খুব একটা দূরে হয় না। বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাদের সঙ্গেই যাদের সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজন সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল অথবা সেই সব জায়গায় যাদের সঙ্গে একসময় আত্মীয়তা ছিল কিন্তু ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে সেটা দুর্বল হয়ে এসেছে অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় পুনর্নবীকরন করা হয়।

সাগুন পাঁজাঃ উভয় পক্ষ সম্মত হলেই সাগুন পাঁজা বা শুভ লক্ষণ দেখা হয়। সাগুনের অর্থ হচ্ছে শুভ এবং পাঞ্জার অর্থ হচ্ছে চিহ্ন। তাই সাগুন পাঞ্জায় বেরিয়ে নিম্নলিখিত শুভ এবং অশুভ লক্ষণগুলি দেখা হয়। সেগুলি হল, সাগুন পাঞ্জার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে যাত্রার মুহুর্তে কিম্বা কনের গ্রামে ঢুকবার মুখে যদি আগুন, কুঠার, সাপ কিম্বা শেয়ালকে রাস্তা পার হতে দেখা যায় অথবা আগুন জ্বালাবার কাঠ মাথায় নিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে দেখার অর্থ অশুভ। কিন্তু যদি জল ভর্তি হাঁড়ি অথবা কলসি, পণ্য বোঝাই গরুর গাড়ি কিম্বা বাঘের পায়ের ছাপকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তবে যাত্রা পথের অন্য কোথাও এদের গুরুত্ব নেই। কেবলমাত্র যাত্রা শুরু এবং শেষ হওয়ার মুখেই এদের গুরুত্ব। সাগুন পাঞ্জার নিয়ম হচ্ছে, সাগুন পাঞ্জা ব্যক্তিদের অবশ্যই সূর্যোদয়ের ঠিক আগে কনের গ্রামে জগমাঝির বাড়িতে এসে উঠতে হয়। কনের বাড়িতে কিছুতেই নয়। সাগুন পাঞ্জায় বেরিয়ে, সাগুন পাঁঞ্জার ব্যক্তিরা কিছুতেই কোন অবস্থাতেই উপরোক্ত লক্ষণগুলিকে পাবার কথা নয়, কারণ নিশাচর প্রাণী যারা রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরয় তারা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। ভোর হবার আগেই নিজের নিজের গুহায় ফিরে যায়। অপর দিকে গ্রামে প্রত্যেক পরিবারেই গৃহপালিত পশুরা থাকে। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ির মেয়েরা ঘর

উঠোন ঝাঁট দিয়ে তবেই হাঁড়ি কলসি নিয়ে কুয়োয় জল আনতে যায়। ঘুম থেকেই উঠে কেউ জল আনতে যায় না। কাজেই এ সব চিহ্ন দেখার কথা নয়। কিন্তু যদি দেখা হয় তখন সম্বন্ধের ইতি ঘটানো হয়। আর যদি না দেখা হয় তবে গ্রামের জগমাঝির ঘরে গিয়ে উঠতে হয়। কারণ হাঁক ডাক দেওয়ার দায়িত্ব জগমাঝিরই। তখন জগমাঝি কনের বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। খবর পেয়েই কনের বাবা গ্রামের অন্য দু জন মেয়ের সঙ্গে (মোট তিনজন) কনেকে জগমাঝির বাড়িতে গড জহার অর্থাৎ প্রণাম জানাতে পাঠিয়ে দেয়। কনে মাঝখানে থাকে। কনে গড জাহার করতে এলেই রায়বার ইশারায় সে কথা জানিয়ে দেয়। গড জহার সারা হলেই মেয়েরা যে যার বাড়িতে চলে যায় অন্যদিকে আবার সাগুন পাঁজা ব্যক্তিরাও নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। অনুরূপ ভাবে কনেপক্ষের লোকেরাও একই রকম ভাবে বরকে দেখে আসে। এখানে বিশেষভাবে যেটা উল্লেখ করার তা হল হিন্দুদের কনে দেখার পদ্ধতি আলাদা। তারা সোজা কনের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত থাকে এবং তাঁরা কনেকে রীতিমতন Interview করে, বাজিয়ে দেখে। এইভাবে ক্রমাগত Interview দিতে দিতে এক সময় কনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু সাঁওতালদের যা পদ্ধতি তাতে অনেক সময় কনে টেরই পায় না। প্রতিক্রিয়াতো দূরের কথা।

জমঞ্‌ু—সাগুন পাঞ্জায় কোনো বাধা বিঘ্ন না ঘটলে এবং সমাপ্ত হয়ে গেলেই জমঞ্‌ু অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার দিন ধার্য হয়। সাগুন পাঁজার পরবর্তী রীতিনীতি গুলিকে বলা যায় Formality. কারণ সাঁওতালরা অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করলেও তাদের এলাকা সীমানা দ্বারা চিহ্নিত। এলাকাগুলি হল মান, বারাহ, পাতকুম, সাঁত, শিকার, তুং, ধাড়, কুচুং ইত্যাদি। ইতিহাসের পাতায় যে বারো ভুঁইয়ার উল্লেখ আছে, এরাই সেই বারো ভুঁইয়া। এই সব এলাকায় এক একজন প্রধান এখনও বহাল তবিয়তে আছে যদিও তাদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ নামটাও খুব সম্ভব এঁরাই দিয়েছিলেন। এই সব এলাকার সন্নিহিত অঞ্চল সমুহের রীতিনীতি প্রায় কাছাকাছি। জমঞ্‌ু অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার সূচনা হয় কনের বাড়িতে। নির্ধারিত দিনে বরকর্তা গ্রামের মাঝি অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল সহ গ্রামের বেশ কয়েক জনকে নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। P.O. Bodding, Tradition and institution of santals গ্রন্থে বর কর্তার বাড়িতে সর্ব প্রথম জমঞ্‌ু অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ বিয়েতে দেনা পাওনার একটা বিষয় থাকে যদিও সেটা যৎ সামান্য। আমি আগেই বলেছি সাঁওতালদের মধ্যে বরপণের বদলে কনে পণের প্রচলন আছে এবং সেটা কনের বাড়িতে বসেই ঠিক হয়।

সেই কনে পণ নির্ধারিত না হওয়া অবধি কেউ কারো অন্নগ্রহণ করে না, এটাই সাঁওতালদের রীতি। সাঁওতালদের মধ্যে নগদে দেওয়া নেওয়ার প্রচলন নাই। ইদানীং যদিও কেউ কেউ সাইকেল, ঘড়ি এবং রেডিও উপহার হিসাবে দিচ্ছেন। সেগুলি হল ব্যতিক্রমী ঘটনা। রীতিনীতি বলতে শুধু কনে পণকেই বোঝায়। এই কনে পণের অঙ্ক কিন্তু বারো ভুঁইয়ার সব জায়গায় সমান নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এর তারতম্য আছে। কোথাও কোথাও এই অঙ্ক তিন টাকা হলে কোথাও পাঁচ টাকা হয় আবার কোথাও সেটা সাত টাকার হয়ে থাকে। তবে এখানে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হল টাকার অর্থ নগদ টাকা পয়সা নয়, এটা প্রতীকি। এখানে তিন টাকার অর্থ তিন তিনটে শাড়ী অনুরূপ ভাবে পাঁচ এবং সাত টাকার ক্ষেত্রে যথাক্রমে পাঁচ এবং সাত সাতটা শাড়ী। এই শাড়ীগুলো কনের মা, মাসী এবং পিসিমাদের প্রাপ্য যারা এতদিন ধরে মেয়েকে লালন পালন করে বড় করে তুলেছে। চিরদিনের জন্য তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তাদের জন্য যৎ সামান্য তোফা।

নির্ধারিত দিনে রায়বার বরপক্ষকে নিয়ে কনের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। বরপক্ষে থাকে বরকর্তা স্বয়ং, আতুমাঝি অর্থাৎ মোড়ল এবং সঙ্গে গ্রামের বেশ কিছু লোকজন। যেহেতু দিন আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাই পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই আতুমাঝি অর্থাৎ গাঁয়ের মোড়ল, জগমাঝি (তার সহকারী) এবং আরো কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের সঙ্গে গ্রামে ঢুকবার আগেই গ্রামের শেষ প্রান্তে নবাগতদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হয়, সঙ্গে কলসি ভর্তি জল, একটা ঘটি এবং পিঁড়ি। ভিন গায়ের আগন্তুক অতিথিদের এখানে পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে আতু মাঝির। তারপরে অন্যদের পা ধোওয়া হয়। পা ধোওয়া হয়ে গেলেই কনের বাড়িতে আনা হয়। এখানে পৌঁছালেই বসতে দেওয়া হয়। কনের বাড়িতে সমবেত মেয়ে বউরা তৈরি হয়েই থাকে। তাই বসবার সঙ্গে সঙ্গেই দু হাতে জলের ঘটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং সর্ব প্রথম উভয় পক্ষের মাঝি বা গ্রামের মোড়লের সামনে জলের ঘটি নামিয়ে সাঁওতালি প্রথায় গড জহার অর্থাৎ নমস্কার জানায়। নমস্কারের পালা চুকে গেলেই শাল দাঁতন এবং তেল গামছা নিয়ে পুকুরে অথবা নদীতে স্নান করতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান করা হয়ে গেলেই পুনরায় কনের বাড়িতে নিয়ে আসে। জগমাঝি হাত ধোওয়ার জল নিয়ে আসে এবং অতিথিদের হাত ধোওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। হাত ধোওয়া হয়ে গেলেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে পাটিয়া (খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের মাদুর। বাড়ির মেয়েরাই তৈরি করে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে বাড়ির বারান্দায় বসে তৈরি করে) অর্থাৎ মাদুর পাতা থাকে সেই মাদুরে সবাইকে বসতে অনুরোধ করা হয়। এই দলে অতিথিদের সঙ্গে আতুমাঝি অর্থাৎ মোড়ল ছাড়াও গ্রামবাসীরা থাকে।

জগমাঝি ত থাকেনই। এই সব অনুষ্ঠান তিনিই পরিচালনা করেন। এ সব তাঁর দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। হিন্দুদের যেকোন অনুষ্ঠানেই অতিথিরা আসে, কবজি ডুবিয়ে খায়। খাওয়া দাওয়া সারা হলেই কাপড়ে হাত মুছে পান চিবোতে চিবোতে চলে যায়। কিন্তু সাঁওতালদের বেলায় তা হয় না। গ্রামের সবাই হাত লাগায়। সমাজ বলতে কি বোঝায়? সাঁওতালদের না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। সমাজ কাকে বলে সেটা জানতে হলে সমাজ বিজ্ঞানীদের অবশ্যই সাঁওতালদের সংস্পর্শে আসতে হবে। তা না হলে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অধরা থেকে যাবে।

এইবারে অতিথিদের সবাইকে শাল পাতার তৈরি পাতড়া এবং ফুডুঃক দেওয়া হয়। এ সব বাড়ির মেয়েরাই শাল জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহ করে অনুষ্ঠানের অনেক আগে থেকেই তৈরি করে রাখে। এইবারে সামান্য কিছু জল খাবারের জন্য চিড়ে এবং গুড় দেওয়া হয়। চিড়ের বদলে মুড়িও হতে পারে। এই গুড় চিড়ের সঙ্গে জল দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়া হয়। জল খাবারের পর পানীয় জল হিসেবে মিৎ বার ফুডুঃক অর্থাৎ সামান্য কিছু হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া দেওয়া হয় কারণ তার পরেই আসল কাজ শুরু হবে। জল খাবার খাওয়া হলেই দেনা পাওনার আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনায় দুই পক্ষের দুই আতু মাঝি অর্থাৎ মোড়লরাই অংশগ্রহণ করে। তবে এখানে বিশেষভাবে যেটা উল্লেখ করার সেটা হল দুই পক্ষ মুখোমুখি আলাচনায় বসে না এবং বর এবং কনের বাবা—মারা কোনো অবস্থাতেই সোজাসুজি এই আলোচনা চালাতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত কেউ আলোচনা করতে সাহস পায়নি। কিন্তু যদি কেউ গোপনে এসব ঠিক করে তবে তাকে আইন ভঙ্গ কারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ডেকে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি সাগুন পাঞ্জার পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি Formality ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বারো ভুঁইয়ার সব কটিতে না হলেও সন্নিহিত অঞ্চল সমুহের রীতিনীতি প্রায় কাছাকাছি, সুনির্দিষ্ট, নির্ধারিত নিয়ম কানুন। এই সব নিয়ম কানুনের বাইরে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। তাই প্রথা অনুযায়ী আলোচনা হয় বটে। তবে নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে যাবার ক্ষমতা কারো নাই। আবার আলোচনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার জন্য সরাসরি কেউ কোথাও আলোচনায় বসে না। আলোচনা চালাবার জন্য শাল পাতার তৈরি ফুডুঃক অর্থাৎ বাটি ব্যবহার করা হয়। সেই বাটিতে কয়েকটি ধাতুর মুদ্রা ফেলে দেওয়া হয়। সেই বাটির ধাতু মুদ্রাকে নিয়ে আসা এবং নিয়ে যাওয়া হয়। এই কাজ কিন্তু যে কেউ করে না করে জগমাঝি যে নিজে একজন দায়িত্বশীল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদাধিকারী। দেনা পওনার পাট চুকে গেলেই অতিথি আপ্যায়ন শুরু হয় অর্থাৎ ভুরি ভোজের আয়োজন করা হয়। ক্রমে সন্ধ্যা নামে রাত গভীর হয় তখন নাচগানের আসর

বসে এবং সকাল পর্যন্ত সেটা ধারাবাহিক ভাবে চলে। অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নাচগান। নাচ থেকে গান কিম্বা গন থেকে নাচকে আলাদা করা যায় কিনা আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে সেটা বলা কঠিন তবে ইদানীং বিয়ে বাড়িতে নাচ গানের বদলে মাইকের ব্যবহার দেখছি, আবার রেডিও দুরদর্শনে কেবল গান, নাচতে দেখি না। সাঁওতালরা এখন নাচে না, নাচতে ভুলে গেছে।

জম, ঞুতে আসা অতিথিরা কাছাকাছি হলে খাওয়া দাওয়ার পরেই বিদায় নিয়ে চলে যায় কিন্তু একটু দূরের হলে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে হাত মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে চলে যায়। অপরদিকে কনে পক্ষের লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে বরপক্ষের গ্রামে গিয়ে হাজির হয়। প্রথা এক তবে এখানে দেনা পাওনার ব্যাপারটা থাকে না।

জম, ঞুর পাট চুকে গেলেই বিয়ের দিন ধার্য হয়, বিয়ের বাজনা বাজে। উভয় পক্ষ তৈরি হয়। রায়বার আসে যায়। তারপর নির্ধারিত দিন কাছাকাছি হলেই বরপক্ষের জগমাঝি বরের বাড়িতে জড়ো হবার জন্য গাঁয়ের লোকজনকে বলে এবং কনেপক্ষের জগমাঝি কনের বাড়িতে জড়ো হতে বলে। বরকর্তা এবং কনেকর্তা উভয়েই উভয়পক্ষের লোকজনকে হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া খাওয়ায় তখন সমবেত লোকজন জিজ্ঞেস করে এটা কিসের হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া? বরকর্তা জবাব দেয় 'গিরা' তল হাঁড়ি অর্থাৎ বিয়ের আর দেরি নেই তাই আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামবাসীকে বিয়ের নেমন্তন্ন দেওয়ার জন্য গিরা তৈরি করতে হবে, বলেই সে বাড়ির ভিতরে ঢোকে এবং একগাছি সুতো, গুঁড়ো করা হলুদ নিয়ে আসে। গ্রামের লোকজন সেই সুতোয় গিঁট দিয়ে হলুদ দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। রায়বার বা ঘটক সেই গিরা বা গিঁট দেওয়া সুতো কনের বাড়িতে নিয়ে যায় অবশিষ্ট গিরা দিয়ে বরকর্তা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামবাসীকে নেমন্তন্ন করে। অনুরূপ ভাবে কনেকর্তাও তার বাড়িতে তৈরি গিরা দিয়ে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং গ্রামবাসীকে নেমন্তন্ন করে।

হলুদ রাঙানো সুতোয় অর্থাৎ গিরায় তিন অথবা পাঁচটা গিঁট দেওয়া থাকে যার অর্থ তিনদিন অথবা পাঁচদিন পরে বিয়ে। আমার মনে হয় এই গিঁট থেকেই গিরা কথাটা এসেছে। বরকর্তা এবং কনে কর্তা উভয়েই নিমন্ত্রিতদের সবাইকেই একটা করে গিরা দিয়ে মুখেও বলে দেয় অমুক দিন বিয়ে আপনি/আপনারা সেদিন সপরিবারে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। এখানে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিয়ে বাড়িতে গ্রামের সবার নিমন্ত্রণ হয়ত থাকে না তবে অনুষ্ঠানে সবাইকেই হাজির হতে হয় গ্রামবাসী হিসেবে। হিন্দু এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের যে কোন অনুষ্ঠানেই কেবলমাত্র নিমন্ত্রিতরাই আসে। কিন্তু সাঁওতালদের

ক্ষেত্রে তা হয় না। যে কোন অনুষ্ঠানেই গ্রামবাসীদের সবাই জড়ো হয়। কারণ অনুষ্ঠানের যা সব রীতিনীতি তাদের অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব কর্তব্য তাদের উপরেই ন্যস্ত।

গায়ে হলুদ/সুনুম সাসাং : বিয়ের তিনদিন আগে হয় গায়ে হলুদ। সেদিন সূর্য অস্ত যাবার পরেই গ্রামের নারী পুরুষ সবাইকে জগমাঝি যথাক্রমে বর কনের বাড়িতে জড়ো হতে ডাক দেয়। সেই মত সবাই জড়ো হয়। প্রথমে দুজন তেতরে কুড়ি অর্থাৎ কুমারী মেয়েকে নির্বাচিত করে, যারা বর কনেকে গায়ে হলুদ দেয় এবং বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যথাক্রমে বর এবং কনের বাড়িতেই থাকে। এরপর শুরু হয় গায়ে হলুদ দেওয়ার কাজ। সর্বপ্রথম গ্রামের মাঁঝি হাড়াম এবং তাঁর ধর্মপত্নীর গায়ে হলুদ হয়। এইভাবে গ্রামের মান্যগণ্যদের গায়ে হলুদ দেবার পর বরকর্তা এবং বরকর্ত্রীর পালা। সবশেষে বরের গায়ে হলুদ দিতে হয়। গায়ে হলুদ হবার পরে বর অথবা কনে কেউই একা একা বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। তাদের সঙ্গে থাকে যথাক্রমে লুমতা কড়া এবং লুমতি কুড়ি। এরা সম্পর্কে বর এবং কনের ভাই এবং ভগ্নী হয়। বর এবং কনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও গায়ে হলুদ হয়। এই লুমতা কড়া এবং লুমতি কুড়িরা বিয়ের কদিন বর কনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। গায়ে হলুদের কাজ শেষ হলেই সেদিনের মত অনুষ্ঠান শেষ। সমবেত লোকজন যে যার বাড়িতে চলে যায়।

ছাইলছামডা : তিনদিন বাদেই ছাইল ছামডা অর্থাৎ অধিবাস। সেদিন সকাল থেকেই বর এবং কনের বাড়িতে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। জগমাঝি সকালেই বর এবং কনের বাড়িতে জড়ো হবার জন্য গ্রামবাসীদের ডেকে পাঠায়। গ্রামের লোকজন এসে গেলেই শুরু হয় ছামডা, মডোওয়া বাঁধার কাজ। উঠোনের চারপাশে চারটে খুঁটিপুঁতে তার মাথায় ডালপালা দিয়ে তৈরি হয় ছামডা। ছামডার মাঝখানে মহুয়ার ডাল এবং আগড়ম, বাগড়ম খড়ের তৈরি 'বড়' দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে পুঁতবার জন্য একখানা গর্ত করা হয়। এটাকে বলে মাডোওয়া। এর দুপাশে দুটো ছোটো জলভরা কলসি রাখা থাকে। এদের সাগুন ঠিলি বলে। এই কলসিতে করে তেতরে কুড়ি ছাড়া যে কেউ জল আনতে পারে না। এদের গামছা অথবা ঐ জাতীয় একটা কাপড়ে ঘোমটার মত করে মাথা ঢেকে জলের কলসি কাঁখে নিয়ে পাশাপাশি হেঁটে জল আনতে হয় এবং মাডোয়ার সামনে মাডোওয়া বিসর্জন দেবার আগে পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। এর পর থেকে যা কিছু অনুষ্ঠান সবই এই মাডোওয়ার সামনে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালি ভাষায় এই দিনটাকে ছাইল ছামডা অর্থাৎ ছামডা বা ছাউনি বাঁধার দিন বলে। ছামডা বাঁধা হয়ে গেলেই যারা ছামডা

বা ছাউনি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিল তাদের ছামডা দাকা অর্থাৎ ভাত দিতে হয়। অনুষ্ঠান তখন কার মত এখানেই শেষ।

অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয় সন্ধ্যায়। জগমাঝি পুনরায় ডাক দেয়। ডাক পেয়ে গ্রামের নারী পুরুষ সবাই একে একে বিয়ে বাড়িতে আসতে শুরু করে। ইতিমধ্যে আত্মীয় স্বজনরাও এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের জড়ায় না। বিয়ে বাড়ির যা কিছু অনুষ্ঠান তার সবটাই সম্পন্ন করে গ্রামবাসী অর্থাৎ গ্রামের লোকজন। এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় পুনরায় একদফা গায়ে হলুদ দিয়ে। গায়ে হলুদের নিয়ম আগের মতই, প্রথমে মাঝি হাড়াম এবং তার পত্নীর গায়ে হলুদ। এইভাবে পদমর্যাদা অনুযায়ী পর পর গায়ে হলুদ দিতে হয়। বরের গায়ে, গায়ে হলুদ দিয়ে, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শেষ হয়। ছাইল ছামড়ার দিন বর এবং কনের আত্মীয়রা গুড় দাকা অর্থাৎ গুড় দিয়ে রান্না করা ভাত থালায় করে নিয়ে আসে বর এবং কনেকে খাওয়াবার জন্য।

ইতিমধ্যে দাঃক বাপলার সময় হয়। মাঝি বুডহি অর্থাৎ গ্রাম প্রধানের পত্নী নতুন কুলোয় দাঃক বাপলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তেতরে কুড়ি, গ্রামের জগমাঝি এবং লোকলস্কর নিয়ে কাছাকাছি কোনো পুকুরে বা নদীতে দাঃক বাপলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মাঝি বুডহি দাঃক বাপলা সারে। ভেতরে কুড়িরা একসঙ্গে কলসি ডুবিয়ে জল তোলে তখন মাঝি বুডহি তেতরে কুড়ি এবং লোকজন নিয়ে পুনরায় বিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।

তার কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠিত হয় খাঁড়া দাঃক। বাড়ির কাছা কাছি একটা লম্বা অগভীর গর্ত খোঁড়া হয়। তার দুপাশে দুটো জোয়াল ফেলে বরের বাবা, মা এবং বরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বরের বাবা মাথার উপরে দু হাতে একখানি তরোয়াল উঁচু করে উল্টো করে ধরে। গ্রামের জগমাঝি সাগুন ঠিলির জল একটু একটু করে ঢালতে থাকে যাতে সেই জল বর এবং কনের মাথায় এসে পড়ে। এই ভাবে পর পর তিনবার জল ঢালবার পর জল দিয়ে তিনজনেই স্নান করে নেয় এবং বাড়িতে এসে কাপড় বদলায়।

এদিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান মাতকম বাপলা। বাড়ির কাছাকাছি আমগাছে এই 'বাপলা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বরকর্তা বরকে নিয়ে আতুমাঝি অর্থাৎ গ্রামপ্রধানের সঙ্গে গ্রামের লোকজনকে নিয়ে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কনে বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করে। গ্রামে পৌছালেই কনেপক্ষের জগমাঝি গ্রামবাসীদের বর এবং বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানায় অতঃপর বরকে কনের বাড়িতে নিয়ে আসে। কনের বাড়িতে এসেই বর কিন্তু বিয়েতে বসে না। কনের মাথায় সিঁদুর দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন অনুষ্ঠিত হয়। নীচে সেগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেওয়া

হল। তবে এখানে বলে রাখা ভাল সমগ্র অনুষ্ঠানটাই কিন্তু জগমাঝির তত্ত্বধানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জগমাঝিই উভয়পক্ষকেই তৈরি হতে বলে।

বর, কনের বাড়িতে পৌঁছে গেলেই কনের মা কনেপক্ষের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে বরকে বরণ করে। আগেকার দিনে গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতেই বাড়ির মেয়েরা বরকে গুড় জল খাওয়াত এখন কেবলমাত্র কনের বাড়িতেই খাওয়ায়।

একটু পরেই হরঃক চিনহা। তার জন্য বর এবং কনেকে পালা করে ছামডার নীচে মাদুরের উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন যার যা, যাকে দেওয়ার শখ থাকে এই অনুষ্ঠানে লোকজনের সামনে তা দিতে হয়। তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়।

হরঃক চিনহা চুকে গেলেই বরকে স্নান করানো হয়। কনে বাড়ির বাইরে মাঝ রাস্তায় পিঁড়িতে বসিয়ে বরকে স্নান করায় কনের নিজের বোন অথবা দিদিরা। তারা বাড়ি থেকে জল আনে এবং তেল সাবান দিয়ে বরকে স্নান করিয়ে দেয়। ভেজা কাপড় পালটাবার জন্য কনের বাড়ি থেকে হলুদ দিয়ে রাঙানো ধুতি দেওয়া হয়।

স্নান পর্ব চুকে গেলেই হয় শালা দাহড়ি। শালাকে সাঁওতালি ভাষায় বলে ইরিল কড়া কিন্তু অনুষ্ঠানের নাম কেন যে শালা দাহড়ি হল বোঝা যায় না। অনুষ্ঠানের সময় বর তার ভগ্নীপতির কাঁধে উঠে। এই ভগ্নী পতিকে কোথাও কোথাও বাঁবড়ে আবার কোথাও সাদম বলে। এই বাঁবড়ে বা সাদম ছাইল ছামডার দিন থেকেই বরের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বরকে পরিচালনা করে। অন্যদিকে আবার কনের ভাইও অর্থাৎ বরের হবু শালা তার ভগ্নীপতির কাঁধে চড়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। প্রথমে উভভয়কেই তিনবার এপাশ ওপাশ করা হয় পরে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। মুখোমুখি হলেই প্রথমে দুজনে কোলাকুলি করে। কোলাকুলি শেষে একে অপরকে পান খাওয়ায় সবশেষে বর তার হবু শালার মাথায় হলুদ রাঙানো একটা ধুতি পাগড়ির মত করে বেঁধে দিলেই অনুষ্ঠান শেষ।

শালা দাহড়ির পরেই হয় ইতুৎ সিন্দুর যেটা বিয়ে বাড়ির মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জগমাঝি বরযাত্রীদের ডেরায় আসে এবং কয়েকজনকে নিয়ে কনের বাড়িতে ঢোকে যারা সম্পর্কে বরের ভাই এবং দাদা হয় অর্থাৎ কনের হবু দেওর এবং ভাসুর। বাড়িতে ঢুকলেই এদের বাড়ির এক কোনে বসতে দেওয়া হয়। শাল পাতার বাটিতে করে বাড়ির মেয়েরা হাঁড়ি বা হাঁড়িয়া নিয়ে আসে পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে হলুদ গোলা জল দিয়ে জামা কাপড় রাঙিয়ে দেয়। একটু পরেই তাদের সামনে বেতের বোনা নতুন খালি দাউড়া আনা হয়, একসময় নববধূকে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। কনেকে বসিয়ে দিলেই যারা নববধূকে আনতে

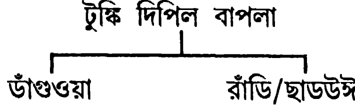
ঢুকেছিল তারা সকলে মিলে দু হাত দিয়ে দাউড়া উপরে তুলে ছামডা বা ছাউনির নীচে নিয়ে আসে। বরকে বাঁবড়ে বা সাদম কাঁধে করে ছাউনির নীচে নববধূর সামনা সামনি নিয়ে আসে। দু পাশে দু জন ঘটিতে করে জলের মধ্যে আমের ডাল নিয়ে দাঁড়ায়। বর এবং কনে উভয়ে উভয়কে আমের ডাল ঘটির জলে ডুবিয়ে মোট তিনবার জল ছিটিয়ে দেয়। বর কর্তা পাশেই সিঁদুর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বর তার বাবার হাত থেকে সিঁদুর নিয়ে নববধূকে সিঁদুর পরাতে উদ্যত হলেই জগমাঝি পথ আগলে দাঁড়ায়। শালা দাহড়ির সময়ও জগমাঝি পথ আগলায় বটে, তবে তখন সে কিছু নেয় না। কিন্তু এইবারে ধুতি না পেলে পথ ছাড়ে না। ধুতি দিলেই পথ ছেড়ে দেয় বর তখন নববধূর ঘোমটা সরিয়ে পরপর তিনবার সিঁদুর পরিয়ে দেয়। প্রথম দুবার নাম মাত্র সিঁদুর ঘসে কিন্তু শেষবারে সবটাই ঘসে দেয়। সিঁদুর পরানো হয়ে গেলেই বর এবং কনেকে মাটিতে নামিয়ে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কনের মা তার দুই জাকে নিয়ে থালায় আতপ চাল, দুব্বা ঘাস, একটু ভেজা হলুদ গুঁড়ো নিয়ে বেরিয়ে আসে বর কনেকে বরণ করে তারপরে তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায় এবং একসঙ্গে বসিয়ে খাবার দেয়। এত সব করতে করতেই দিন ফুরিয়ে যায় অন্ধকার নামে। রাত্রি গাঢ় হয়। তখন বর এবং কনেকে একসঙ্গে ছামডার নীচে পাটিয়া অর্থাৎ মাদুরে বাঁদাপণের জন্য বসিয়ে দেওয়া হয়। বাঁদাপণে বরপক্ষের লোকজন উপস্থিত থাকলেও অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র গ্রামের লোকজনরাই। বাঁদাপণে অন্যকিছু দিতে হয় না। সামর্থ্য অনুযায়ী নগদ টাকা পয়সা দেয়। বাঁদাপণের পালা চুকে গেলেই বর এবং কনে নিজের নিজের বিছানায় শুতে চলে যায়। তথাকথিত সভ্যদের মত সাঁওতালদের মধ্যে ফুলশয্যার নিয়ম নাই। পরদিন সকাল হতেই উভয়কেই ডেকে তোলা হয়। হাত মুখ ধুয়ে বিদায়ের জন্য তৈরি হতে বলা হয়। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলেই গ্রামের লোকজন, আত্মীয় স্বজন এবং বরযাত্রী বর কনেকে নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। এখানে বর এবং কনেকে পাশাপাশি পাটিয়া অর্থাৎ মাদুরে বসানো হয়। দুপক্ষের দুই গ্রাম প্রধান মুখোমুখি বসেন। উপস্থিত সবার সামনে কনে পক্ষের গ্রাম প্রধান কথা শুরু করে। প্রথমে বরকে উদ্দেশ্য করে বলে বাবা জামাই এতদিন একলা ছিলে। যা কিছুই পেতে একলাই খেতে। কিন্তু আজ থেকে তোমার একজন সঙ্গী হল। এখন থেকে যাই পাবে অর্দ্ধেক খাবে, বাকি অর্দ্ধেক বাড়িতে নিয়ে আসবে, কোথাও গেলে বাড়ির কথা ভুলে যেতে। কিন্তু আজ থেকে বাড়ির কথা মনে করে ঘরে ফিরবে। অনুরূপ ভাবে মেয়েকেও (কনে) উদ্দেশ্য করে বলে মাই (মামণি) এতদিন মা বাবার বাড়িতে আদর যত্নে ছিলে। কিন্তু আজ থেকে

তোমার নিজের ঘর হল, একজন সঙ্গী জুটল। কাজের শেষে স্বামী যখন ঘরে ফিরবে ঘটি জল দিয়ে তাকে সম্মান জানাবে (অতিথিকে ঘটি জল দেওয়া সাঁওতালদের রীতি)। তেষ্টা পেলে খাবার জল দেবে। শ্বশুর শাশুড়িকে শ্রদ্ধা করবে, আপন মা বাবা মনে করে তাদের সেবা করবে। সবশেষে আতু মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে বলে কুটুম, এতদিন আমাদের আদরের মামণির দায়িত্ব আমার হাতে ছিল, সুখে দুঃখে আমি তাকে দেখেছি, আমি তার পাশে দাঁড়িয়েছি। আজ থেকে সেই দায়িত্ব আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি, সুখে দুঃখে আপনি তার পাশে দাঁড়াবেন। যদি কর্তব্যে অবহেলা করে, অন্যায় করে সে কথা দয়া করে আমাকে জানাবেন।

আচ্ছা বলুনত, পৃথিবীর আর কোথাও অন্য কোন জাতির মধ্যে সাঁওতালদের ভাষায় এই সনৎ সেরওয়া আছে? সনৎ মানে ভালো থেকে ভালো এবং সেরওয়া মানে রীতি নীতি কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি। পৃথিবীর বয়স ত কম হল না, ইতিমধ্যে পৃথিবীতে বহু ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে, বহু মনীষী এসেছেন, চলে গেছেন কিন্তু একথা কি কেউ বলেছেন? সাঁওতালদের কাছে বিয়ে কেবলমাত্র দুটো মন এক করে দেওয়া নয়, আরো কিছু। দুটো আলাদা আলাদা গ্রামের গ্রাম প্রধানের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন। তাই গ্রাম প্রধানরা একে অপরকে উদ্দেশ্য করে বলতে বাধ্য হন, এতদিন গ্রামের পাশ দিয়ে গেছেন, এসেছেন কিন্তু আজ থেকে যাবার আসবার পথে গ্রামে পদধূলি দেবেন (আমার কথায় যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে আমি তাঁকে দয়া করে P.O. Bodding এর Traditions and institutions of santals গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করছি)। তথাকথিত সভ্যদের মধ্যে বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, দায় অস্বীকার করছে বলে ভারতবর্ষে এখন Registry বিয়ে Must হয়েছে। হিন্দু এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তার প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ হিন্দুদের বিয়েতে মাইনে করা পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়। কিন্তু সাঁওতালদের বিয়েতে সাক্ষী থাকে দুই গ্রামের দুই গ্রাম প্রধান। জগমাঝিদ্বয়, তেতরে কুড়ি এবং গোটা গ্রাম। তার পরেও রেজেস্ট্রি বিয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়? এত সুন্দর রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে যারা অন্যদের রীতিনীতিকে আপন করে নিতে চাইছে, Traditional এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত রীতি নীতিকে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, ওরে পাগল! এ তোরা কি করছিস?

টুঙ্কি দিপিল বাপলা

টুঙ্কি দিপিল বাপলা। টুঙ্কি, বেতের বোনা একরকমের ঝুড়ি। ঝুড়ির তুলনায় অনেক ছোট। ঝুড়িতে গোবর, হাবিজাবি বহন করা হয় কিন্তু টুঙ্কিতে শুকনো খাবার, চাল, ডাল ইত্যাদি মাথার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই টুঙ্কি মাথায় করে হবু কনে বরের বাড়ি আসে বলেই এই বিয়েকে টুঙ্কি দিপিল বাপলা বলে।



ইতুৎ সিঁদুরে বর, কনের বাড়ি বরযাত্রী নিয়ে সিঁদুর পরাতে যায়। কিন্তু টুঙ্কি দিপিলের বেলায় কনে টুঙ্কি মাথায় নিয়ে বরের বাড়ি আসে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সবার আর্থিক ক্ষমতা সমান হয় না। যাদের আর্থিক ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম, যারা গরীব, যারা অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সমাজের সেইসব দুর্বল লোকেদের জন্যই টুঙ্কি দিপিলের ব্যবস্থা। তাদের বিবাহ যোগ্য কন্যারাই টুঙ্কি মাথায় নিয়ে বরের বাড়ি আসে, বরের বাড়িতেই তাদের ইতুৎ সিঁদুর অর্থাৎ সিঁথিতে সিঁদুর পরাবার আয়োজন করা হয়। তাদের জন্য ধূমধামের আয়োজন করে বরকর্তা স্বয়ং। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি মেনে ধূমধামের সঙ্গে বিয়ে দিলেই কি দুটো মন এক হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে Adjustment গড়ে ওঠে? নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা কি হিন্দুদের মত ভালোবাসার অভিনয় করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে? সাঁওতালরা বললেন না, তারা ভালোবাসার অভিনয় করবে না, তারা আলাদা হয়ে যাবে। এই বিবাহ বিচ্ছিনাদের এবং বিধবাদের অর্থাৎ যাদের স্বামী বেঁচে নেই, সভ্য হিন্দুদের সমাজে তাদের থান কাপড় পরে, নিরামিশ ভোজী হয়ে চতুর্থী একাদশী পালন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়। লমহল সাঁওতাল সমাজে তাদের জন্যও টুঙ্কি দিপিল বাপলার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেহেতু তার সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া হয়ে গেছে তাই বর বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যায় না, টুঙ্কি মাথায় নিয়ে কনেই বরের বাড়ি আসে। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, লোকজন, আত্মীয় স্বজন আসে তবে বর কনের মাথায় সিঁদুর ঘসে না, ঘসে বিয়ের ফুলে। সমাজে এদের মর্যাদা কোথায় সে সম্বন্ধে, বলতে গিয়ে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু বলেছিলেন :—

'হড়ক মেতাম রূপা তাম্বা ইঞঠেনদ সোনাগে
সোনা খনহঁ সরেশ যাঁহা আমদ অনাগে।।'
(লাঁগড়ে সেরেঞ)

অর্থাৎ, 'লোকে তোমাকে রূপা তামা যে যা বলে, বলুক। আমার কাছে তুমি সোনার মতই খাঁটি। বরং সোনার চেয়েও বেশি খাঁটি যদি দুনিয়ায় কিছু থেকে থাকে তাহলে আমার কাছে তুমি তাই।'

'অন্যদের থেকে এদের মর্যাদা কোন অংশই কম নয়।' প্রশ্ন উঠতে পারে যদি তাই হয় তাহলে লোকে তুচ্ছ কারণে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। একথা চিন্তা করেই সমাজ তাদের অধিকার সামান্য খর্ব করেছে। কারণ কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। 'গাছেরও খাবো তলারও কুড়াবো', তা হয় না। এ কথা শুনে নারীবাদীরা বলতেই পারেন, এটা বৈষম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নারীদের অধিকার খর্ব হবে অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে কিছুই হবে না এটাকে বৈষম্য ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? তাদের কথার উত্তরে বলি, অন্যদের মত সাঁওতালরা পাত্র খোঁজে না, পাত্রী খোঁজে। ছেলে যদি অকারণে বিয়ে ভেঙ্গে দেয় তাহলে তার পাত্রীই জুটবে না, তাকে বিয়ে না করে সারা জীবন কাটাতে হবে।

হড় খানগে পেড়া

হড় খানগে পেড়া অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই অতিথি। এটাই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দর্শনের মূল কথা। তাঁদের এই দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই লেখা যায়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে কেবলমাত্র এক কথায় তিনটে মাত্র শব্দ দিয়ে অভূতপূর্ব মুন্সিয়ানায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। হড় কথাটার দুটো অর্থ হয়। এক অর্থে শুধুমাত্র সাঁওতালদের বোঝায়। যেমন, তৎকালীন বিহার সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'হড় সম্বাদ' সাহিত্য পত্রিকা। তাই কেউ কেউ হড় সম্বাদের হড় অবতারণা করে বিতর্কের সৃষ্টি করতেই পারেন, কিন্তু সাঁওতালরা হড় শব্দটাকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার না করে, ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করে। তাঁরা যে মানুষকে অতিথি এবং অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞান করেন তার সমর্থনে আমি গুটিকয় যুক্তির অবতরণা করব। প্রথম যুক্তি হিসেবে আমি, 'The Annals of Rural Bengal এর লেখক ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টারের মন্তব্য উপস্থিত করব। তাঁর কথায় :

'Unlike the Hindu, he never thinks of making money by a stranger, scrupulously avoids all topics of business, and feels pained if payment is pressed upon him for milk and fruits which his wife brings out. When he is at last prevailed upon to enter upon business matters, his dealings are off hand. He names the true price at first, which a lowlander never does, and politely waives all discussion of beating down' (পৃষ্ঠা-১৪৯/১৫০)

অর্থাৎ, 'হিন্দুদের মত অপরিচিতদের কাছ থেকে সে টাকা নেওয়ার কথা চিন্তাই করে না। অর্থের বিনিময়ে লেনদেনের রাস্তা সে পরিহার করে। দুধ এবং কাঁচা সবজি যেটা তার বউ বাইরে এনেছে তার জন্য টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিলে সে যন্ত্রণা অনুভব করে। অবশেষে যখন সে কারবার করতে ঢোকে তখন সে ঝাড়া হাত পা হয় এবং প্রথমে সে সঠিক মূল্যই বলে যেটা সমতল ভূমিতে বসবাসকারীরা কোনওদিন করে না এবং শান্ত ভাবে দরদামের সমস্ত রাস্তাই পরিহার করে।'

আমার দ্বিতীয় উদাহরণ, ছোটনাগপুর মালভূমি, যেখানে আদিবাসীরা অতীতেও ছিল এখনো বহাল তবিয়তে আছে। এই ছোটনাগপুর মালভূমিতে সাঁওতালরা ছাড়াও আছেন অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য ধর্মাবলম্বীর লোকজন যারা বাপ ঠাকুরদার আমল থেকেই এতদঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। পাশাপাশি বসবাসের ফলে অনেকের সঙ্গেই সাঁওতালদের পরিচয় আছে, অনেকের সঙ্গে মধুর সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সাঁওতালরা কৃষিজীবি। মাঠে ধান বোনা ছাড়াও বাস্তু জমিতে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি উৎপাদন করে থাকে। সাঁওতালদের আশে পাশে বসবাসকারী অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী লোকজন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যদি সাঁওতালদের বাড়িতে এসে পড়ে—যদি তারা পরিচিত হয় তাহলে ত কথাই নেই, কিন্তু অপরিচিতদের মধ্যেও যদি কেউ আগ্রহ দেখায় তবে সাঁওতালরা তাদের বাস্তু জমিতে উৎপাদিত কাঁচা সবজি এমনিতেই দিয়ে দেয়, তার জন্য তারা কোনো পয়সা দাবী করে না।

পরিশেষে আসছি ফুল পেড়ার কথায়। নির্দিষ্ট দু একটা মহানগরের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে গঞ্জে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের আত্মীয়তার বন্দনে আবদ্ধ হওয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধই শুধু নয় আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টিকারীকে সামাজিকভাবে এক ঘরে করা হয়। তাই ছোটনাগপুর মালভূমিতে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে অদ্ভূত এক আত্মীয়তার বন্ধন চালু আছে, সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে ফুল পেড়া যার বাংলা মানে হয় সই পাতানো। সাঁওতালদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বয়স অথবা চেহারা যে কোনো একটায় সাদৃশ্য অর্থাৎ মিল যদি থাকে তখন সেই দুজনের মধ্যে ফুল অর্থাৎ সই পাতানো হয়। তারা নিজেরা একে অপরকে ফুল, ও ফুল বলে সম্বোধন করে আবার মা, বাবাকেও ফুল মা ফুল বাবা বলে ডাকে। এই ফুল পেড়ার বাহ্যিক উদ্দেশ্য যদিও আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করা, কিন্তু আসলে বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে কলাটা, মুলোটা হাতিয়ে নেওয়া। সত্য কথা বলতে

কি সাঁওতালরা ফুলের মতই নিষ্পাপ, গঙ্গার মতই পবিত্র। কিন্তু তাদের এই সরলতা, উদারতাকে দুর্বলতা মনে করে, পুঁজি করে তার প্রতিবেশীরা তাকে এতদিন ধরে ঠকিয়েছে, শোষণ করে এসেছে। তাই সাঁওতালরাও এখন সচেতন হয়েছে, চালাকি করতে শিখেছে কারণ ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবেইতো।

ধরম বা ধর্ম

ধর্ম নিয়ে মূল আলোচনায় যাবার আগে ধর্ম কোথা থেকে এল তা আলোচনা করা দরকার। বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এতদিনে প্রকৃতির সব রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে মানুষ ছিল অসহায়। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তারা দেবতার কোপ বলে মনে করত। তাই দেবতার কোপ থেকে রেহাই পাবার জন্য, দেবতাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা দেবতার পূজা করত। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদিকে মানুষ একাধিক দেবতার পরিকল্পনা বলে মনে করত বলেই আমরা একাধিক দেবতার অস্তিত্ব বা দর্শন পাই। একাধিক দেবতার অস্তিত্ব ভারতবাসীর মধ্যে আচে, গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যেও এদের অস্তিত্ব চিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্ম প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারক যীশুখ্রীষ্ট, মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হজরত মহম্মদ। অনুরূপভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মহাবীর জৈন প্রভৃতি। এইসব ধর্মের ধর্মান্তরিত লোকজনরা একাধিক দেবতার পূজা বর্জন করে এক দেবতার পূজা অর্থাৎ একেশ্বরবাদী হয়েছেন। কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে অদ্যাবধি কোন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটেনি অথচ তারা একাধিক দেবতার পূজা করে না। তারা একেশ্বরবাদ বা একমাত্র দেবতায় বিশ্বাসী। সেই একমাত্র ঈশ্বর বা দেবতা হচ্ছেন ম্মারাং বুরু। সাঁওতালদের মধ্যে বারো মাসে তেরো পার্বণ আছে। তবে তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব নাই। মারাং বুরুকেই বারো মাসের তেরো পার্বণে স্মরণ করা হয়। সাঁওতালদের মধ্যে এই ধর্ম বিশ্বাস উন্নত সভ্যতার স্বাক্ষরই বহন করে। অনেকে মারাং বুরুকে বড় পাহাড় বলে অভিহিত করেন, কথাটার আক্ষরিক অর্থও তাই (মারাং মনে বড় এবং বুরু মানে পাহাড়), কিন্তু মারাং বুরু মানে কখনই বড় পাহাড় হতে পারে না। যারা মারাং বুরুকে বড় পাহাড় বলে অভিহিত করেন তাদের কাছে, সাঁওতালদেব মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত কয়েকটি শব্দ বা কথার অর্থ সবিনয়ে জানতে চাই। সেই কথাকটি হল 'হারা বুরু', 'গুজুঃক বুরুঃক', 'বঙ্গা বুরু'। মারাং বুরু যদি বড় পাহাড় হয় তাহলে এই কথাগুলির অর্থ কি? সত্যি কথা বলতে কি মারাং বুরু কোনদিনই

বড় পাহাড় ছিলেন না, তিনি সাঁওতালদের একমেব অদ্বিতীয়ম। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ মারাং বুরু ছাড়াও আরও দু একটা দেবতার পূজা প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, এটা শুধু অনুচিত নয়, সাঁওতালদের মহান ঐতিহ্য ও কৃষ্টির বিরোধী, তাদের মনে রাখা উচিৎ 'বন্যরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে'।

মারাং বুরুকে বড় পাহাড় বলার অর্থ সাঁওতালদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা যেটা কখনই কাম্য নয়।

সাঁওতালি গানে সমাজচিত্র

সাঁওতালি লোকসংগীত সাঁওতাল লোককবিদের রচনা। এদেব রচনার মান বেশ উন্নতই শুধু নয় এসব রচনা কালোত্তীর্ণ। এই সব কালজয়ী রচনার আবেদন দেশ কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বকালের সর্বলোকের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব লোককবি যাঁরা শুধু দিলেন বিনিময়ে কিছুই পেলেন না তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেলেন। 'যারা শুধু দিলে, বিনিময়ে কিছুই পেলে না, যারা বঞ্চিত, যারা শোষিত, যারা অবহেলিত তাদের হয়ে বলবার জন্য' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। কিন্তু সাঁওতালি লোক কবিদের হয়ে বলবার কেউ নেই। সুখ এবং দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ। লোককবিরাও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তাই সামাজিক যে কোন সমস্যায় তাঁরা নির্বিকার থাকতে পারেন না। সবার দুঃখে লোককবি দুঃখী হন, তাঁর মনকে নাড়া দেয়, সেই ব্যথা বেদনাই তাঁর মুখে কথা যোগায়। সেই ব্যথা বেদনার কথাই তার মুখ থেকে গান হয়ে বেরিয়ে আসে। নিম্নে প্রদত্ত সাঁওতালি লোক কবিদের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি থেকে সমাজচিত্রের যে পরিচয় পাই তার কথাই তুলে ধরা হল :

রাহা—দঙ
হয় রিমিল বিজলি আপাবারে
সেরমা খন দাঃক এঞুরুঃক এঙ্গাএঞ তওয়া।।

গানে অন্ত্যমিল নেই। কারণ এ গান সাঁওতালি লোককবিদের রচনা। ইদানীং রচিত গানে অন্ত্যমিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লোককবিদের রচিত গানে অন্ত্যমিল অনুপস্থিত তবে অন্ত্যমিল না থাকলেও গানের প্রতিটি কথায় ছন্দের ঝংকার আছে। এই গানে ইংরেজী সাহিত্যের রোমাণ্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The cloud' কবিতার নিম্নলিখিত বক্তব্যই ব্যক্ত হয়েছে :

এইগানের রচয়িতা 'The cloud' কবিতা পড়া তো দূরে থাক, রোমাণ্টিক

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর নামই হয়ত শোনেননি। আকাশের মেঘ, বৃষ্টির পেছনে যে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে তাও হয়ত তাঁর অজানা, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি যে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই গান লিখেছেন। উদাহরণ হিসেবে এখানে আরো দু একটির কথা উল্লেখ করা হল :

রাহা—দঙ
মাই এ হারায়েনা পেড়াগে বাং
বাবুয় হারায়েনা সঁবলগে বাং।।
মাঝি কওয়াঃক ঢিঙ্কি সাডে লু, লুটুঃক, লু লুটুঃক
ইঞাঃক মনে জিউঈ লুটুঃক, লুটুঃক।।
অর্থাৎ, মেয়ে বড় হল পাত্রের দেখা নাই
ছেলেও বড় হল সম্বল যে নাই।।

মাঝি মোড়লদের ঢেঁকির আওয়াজ শুনি লু, লুটুঃক, লু, লুটুঃক। আমার মনের অবস্থাও লুটুঃক, লুটুঃক।।

গানটি আকাশবাণীর সাঁওতালি অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা। লোককবি এখানে নিষ্ঠুর, রূঢ় বাস্তবকেই তাঁর গানের বিষয় বস্তু করেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজার নিয়ম নেই। তাই গৃহকর্তা মেয়ের বয়স বিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত হলেও বিয়ে দিতে পারছেন না। অন্যদিকে আবার সামর্থ্যের অভাবে ছেলেরও বিয়ে দিতে পারছেন না। এই রকম উভয় সংকটে পড়ে তাঁর মন প্রাণের যে কি অবস্থা তার কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মনের অবস্থা গ্রাম প্রধানদের ঢেঁকির আওয়াজের মতন লুটুঃক, লুটুঃক। গানটি Allegory বা রূপকের সুন্দর উদাহরণ।

*(২)

সেদায় আকালদ
নাসে নাসে দঞও দিশায় গেয়া।।
সিঞও দলে জমা সিঁজ বিলি
ঞিদা দলে জমা মাতকম লাঠে।
অর্থাৎ, 'সেদিনের দুর্ভিক্ষের কথা
আজো একটু একটু মনে পড়ে।।
দিনের বেলার আহার পাকা বেল, আর
মহুয়া ফুলের তৈরি মণ্ডা রাতের আহার।।

দুর্ভিক্ষের ছবি কথাকটির মার প্যাঁচে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। মাতকম লাঠে মহুয়া ফুলকে শুকনো করে তৈরি হয়। নেহাত অভাবে না পড়লে এমন খাবার কেউ খায় না।

(৩)

ইঞ লেকা গাডি রড়মে লান্দায়মে
আম সালাঃ গাডিঞ অডক চালাঃক।।
অর্থাৎ, 'আমার মতন গাড়ি কথা বল হাসো
তবেই তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়। তারপরে একদিন (১৮৫৪) সেই রেল লাইনের উপর দিয়ে রেল গাড়ি ছুটতে শুরু করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন রেল লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি ছুটতে দেখে বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা সাময়িক। ঘোর কাটতেই সে তার অসারতা উপলব্ধি করে তাকে বিদ্রুপ করতে শুরু করে।

সহরায় সেরেঞ

পুরুলিয়া বাজাররে হড় কড়া সিপাহি
ইঞদ আয়ো জাতিঞ ঘুচাও কেৎ।।
ইঞ ঞুতুমতেদ আয়ো নাইকপে ধুবি কপে
ইঞ ঞুতুমতেদ আয়ো কাজ কামায় পে।।

অর্থাৎ, 'পুরুলিয়া বাজারে, মা, পুলিশের কাজ করতে এসে, মা আমার জাত চলে গেল।

আমার নামে মাগো নাপিত ডাকো ধোবি ডাকো
আমার নামে শ্রাদ্ধ শান্তি কর।।'

উপরোক্ত সহরায় গানটি কঠিন কঠোর সামাজিক নিয়ম কানুনকে অবলম্বন করে রচিত। সাঁওতালদের মধ্যে পরিবারের কেউ জাতিচ্যুত হলে তার নামে শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হয। এখানে সে কথাই বলা হয়েছে। জাতিচ্যুত ব্যক্তি সে কথা জানে বলেই তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলছে মা পুরুলিয়ায় চাকরি করতে এসে আমার পদস্খলন হয়েছে, সমাজের রিলামালা (জলবৎ তরঙ্গ) নিয়ম ভেঙেছি। তাই আমার অনুরোধ, ধোবা নাপিত ডেকে যেন আমার শ্রাদ্ধ শান্তি করা হয়। উপরোক্ত গানগুলির মোটামুটি একটি বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল। কিন্তু গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে

পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে সাঁওতালি জানা দরকার। এ সব গানের মূল্য অপরিসীম। এদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। কারণ সাঁওতালদের মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষার আসর বলতে যে শিক্ষাকেন্দ্র বোঝায় তা অতীতেও ছিল না এখনো নেই। লোককবিরা এসব গান রচনা করতেন, নাচগানের আসরে গাইতেন এবং লোকজনকে আনন্দ দিতেন। তবে যে কোনো একজন শ্রোতার পক্ষে মাত্র একবার শুনে সব গান মনে রাখা মুসকিল তা সে স্মরণশক্তি যাই হোক না কেন। দু একটা Common গান হয়ত আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, হরেক রকমের অসংখ্য গানই অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামে গঞ্জে একসময় বিদ্যমান ছিল। এদের বেশির ভাগটিই এখন মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেছে। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ 'Old is gold' 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে' বুঝতে পেরে পুরানো গান সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন, লিপিবদ্ধ করে ব্যাপক অংশের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতেই হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটুকু বলতে পারি, সাঁওতালি লোকসঙ্গীত, বাজনা এবং নাচের আদব কায়দা সব জায়গায় এক নয়। এ সব গান যে সব জায়গা থেকে সংগৃহীত হচ্ছে সে সব গান বাজনা সেই সব জায়গার নিজস্ব। সেগুলিকে সবার বলে পরিচয় দেওয়া অনুচিত বলেই মনে করি।

Phrase (বাগধারা)

(১) বেঁগাড় কচা—(গোপন শলা পরামর্শ)

(২) সের চাওলে—(আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া)

(৩) সারদি এনেচ রেগে তুমাদাঃক-রাপুৎ এনা—(চরম ওঠার পরে হঠাৎ পড়ে যাওয়া)

(৪) বুরসি সেঙ্গেল—(তুষের আগুন)

(৫) লাটিচ—(লোকের কাছে বলে বেড়ানো)

(৬) লপং টুটি—(বুড়ো আঙুল দেখানো)

(৭) সাতে লাতার—(আশ্রয়হীন)

(৮) তাহেন রেদ হাটাঃক হাটাঃক বাংরেদ মাটাঃক মাটাঃক—(বেহিসেবী)

(৯) লহৎ বড়—(কুঁড়ে, অলস)

হারাধন অধিকারীর সৌজন্যে

(১) অকা লেকাম এরা অনালেকাম ইরা—(যেমন কর্ম তেমনি ফল)

(২) অডাঃকতে পাই বল লেনখান বাং ওডোঃক আ—(ঋণ নিলে একবার পরিশোধ হয় না আর)

(৩) আপনারাঃক জমতে বির হাতী লাগা—(ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো)

(৪) একেন ঠিলিদ সাডে গেয়া—(ফৌপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি)

(৫) কাথাগে তাঁহেনা হড়দ বাং—(মানুষ চিরদিন থাকে না, বচন থাকে)

(৬) কাঁড়া, হাপাদ মিৎ ছটগেয় আদা—(ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়, অন্ধ একবারই লাঠি হারায়)

(৭) জানুমতে জানুমগে সাহা হয়ুঃকআ—(কাঁটায় কাঁটা তোলা)

(৮) টাকা খান বাহু, দাকা খান কাহু—(ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না)

(৯) টিঙ্কি বুটাম সেনঃক রেসে লুবুঃক খদেম এ্রাম—(কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না)

উপসংহার

সাঁওতালদের নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কৌতুহলের অন্ত নেই এ কথা, আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সাঁওতালদের নিয়ে বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় যেটা উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল সাঁওতালদের নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও সাঁওতালদের মত এক মহান জাতির রীতিনীতির, সভ্যতা সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিফলন এই সব গ্রন্থে আদৌও ঘটেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ সাঁওতালরা অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল নাই, তারা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধও নয়। তাই তাদের রীতিনীতি, আচার আচরণ ইত্যাদি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অন্যদিকে সাঁওতালদের নিয়ে রচিত পুঁথিগুলির রসদ বিশেষ বিশেষ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ও রচিত। ফলে সেই সব গ্রন্থে সেই সব অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেই প্রতিফলিত হয়েছে, সমগ্র সাঁওতাল সমাজের প্রতিফলন তার মধ্যে নেই। তাই তাকে সমগ্র সাঁওতাল সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করা অন্যায় শুধু নয়, অনুচিত। দু, একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দঙ লাগড়ে, বাহা এবং সহরায়ের প্রচলন entire সাঁওতাল সমাজেই আছে। বাদ্য যন্ত্র হিসেবে মাদল এবং নাগড়ার প্রচলনও সব জায়গায় আছে। গানের সুর এবং বাজনা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই মেদিনীপুর, সিংভূম কিম্বা

সাঁওতাল পরগণার দুমকার সঙ্গে পুরুলিয়ার গান বাজনার মিল নেই। এই বৈচিত্র্য শুধুমাত্র গান বাজনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এই পার্থক্য সমাজের সব ক্ষেত্রেই, সবত্রই বিদ্যমান। তাই সাঁওতাল পরগণার দুমকা থেকে অথবা উপসংহারে উল্লেখিত যে কোন একটি অংশ থেকে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্যকে সমগ্র সাঁওতাল সমাজের বলে দাবী করা ঠিক নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

উপসংহার লিখতে গিয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম বলেই বহুকাল আগের হলেও স্পষ্ট মনে আছে। ঘটনাটা গ্রামের সামান্য এক শখের যাত্রাপালাকে কেন্দ্র করে। গ্রাম বাংলায় একসময় যাত্রা পালার বেশ প্রচলন ছিল। সেখানে আয়োজন থেকে শুরু করে অভিনয় সবই গ্রামের ছেলেরাই করতেন। এ রকমই কোনো এক শখের যাত্রায় ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামে যাত্রাপালার আসর বসবে। মঞ্চ তৈরি, চারপাশে চারটে খুঁটি পুঁতে সামিয়ানাও টাঙানো হয়েছে। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। লোকজন রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে মঞ্চের চারপাশে এসে ভীড় জমিয়েছে। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। কখন গ্রীনরুমের পর্দা উঠবে, যাত্রা শুরুর ঘণ্টা বাজবে? অবশেষে এক সময় গ্রীনরুমের পর্দা উঠল, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই শখের যাত্রা শুরু হল। কিন্তু প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অভিনয় দেখেই দর্শকরা হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ আর কিছুই নয়, গাঁয়ের পঞ্চানন যাকে সবাই পচা বলে ডাকে তার গায়ে রাজার পোশাক। দর্শক শ্রোতা তাকে রাজা বলে মানতে নারাজ। ফলে যাত্রাপালা সুঅভিনীত হলেও দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। আলোচ্য 'অথ সাঁওতাল কথা' পড়েও পাঠকের মন খারাপ হতে পারে কারণ এতদিন পর্যন্ত যাদের Aboriginal, Semi Savage বলে জেনে এসেছি তাকে মহান বলে গ্রহণ করতে মন চাইবে না। তাদের কাছে আমার অনুরোধ বইটি পড়ার আগে এতদিন ধরে প্রচলিত Aboriginal এবং Semi-Savage শব্দগুলি মন থেকে সরিয়ে নিন, দেখবেন এতদিন পর্যন্ত যাকে অবহেলা করে এসেছেন, বঞ্চিত করে এসেছেন তাকেই মহান বলে মনে হবে। তাই আমার বক্তব্য, যা আমি বলতে চাই—ওরা হচ্ছে সাঁওতাল Aboriginal বা Semi Savage নয়! বুনো ওল কিম্বা বাঘা তেঁতুলও নয়। সাঁওতাল অর্থাৎ 'The Santal', আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক মার্টিন ওরান্সের কথায় 'A Tribe in Search of a great tradition.'

সমাপ্ত